অসাধারণ

উপন্যাস

(টুর্গেনিভের অনুবাদ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

সুধী বন্ধু

ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর-কমলেষু

অসাধারণ

এক

ইয়াকভ পাশিনকভ

শীতকাল। পীটার্সবার্গে কার্ণিভাল চলেছে। যেদিন কার্ণিভাল খোলে, সেদিনকার ঘটনা।

আমার এক বন্ধু,—স্কুলে আমরা এক-ক্লাশে পড়েছি দুজনে—সেই বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলুম ডিনারের নেমন্তন্ন। বন্ধুটি ভারী ঠাণ্ডা মানুষ। নিরীহ আর লাজুক বলে' বন্ধুর খ্যাতি ছিল! কিন্তু পরে জেনেছি, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে এতটুকু সংযম মানতেন না! বন্ধু আজ বেঁচে নেই···অন্য সহপাঠীদের মতো···পরলোকে।

যাক, যা বলছিলুম···নেমন্তন্ন গিয়ে শুনলুম, আরও দুজন ভদ্রলোক আসছেন। একজনের নাম আলেকজান্দ্রোভিচ্ আশানভ, আর-একজন সে-যুগের মস্ত সাহিত্যিক। সাহিত্যিকটি আমাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন—শেষে তাঁর চিঠি এলো, তিনি আসতে পারবেন না; এবং তিনি না এসে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে' আর এক ভদ্র-লোককে পাঠাচ্ছেন। এ-ভদ্রলোকটি অদ্ভুত জীব। বিনা-নিমন্ত্রণে প্রতিনিধি সেজে যিনি নিমন্ত্রণের আসরে আসতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁর সম্বন্ধে মানুষের ধারণা হয় কেমন, সে-কথা সবিস্তারে না বললেও চলে।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া চললো অনেকক্ষণ ধরে। বন্ধু সুরার আয়োজন করেছিলেন বেশ ভালো-রকম ; তার ফলে আমাদের মাথা ধীরে ধীরে বেশ বিকল হয়ে এলো। মাথার এ-বৈকল্যে সকলের মনের কপাট গেল খুলে এবং মনের নিভৃত কোণে যার যত-কথা লুকোনো ছিল, সেগুলো ফেনার মতো উছ্‌লে পড়লো! লাজুক-বন্ধুর সরম-সঙ্কোচের আবরণ হঠাৎ খশে গেল···তার মুখে-চোখে আদিম-ইতরতার আভাস জাগলো। আবেগ-উচ্ছ্বাসে এমন সব কথা সে বলতে লাগলো যে নেশার ঘোর থাকলেও লজ্জায় আমার গা এলো ছমছমিয়ে। বন্ধুর ভব্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বেশ উঁচু ছিল। তাঁর সে-ভাব দেখে আমি অবাক!···কিন্তু তাঁকেও টেক্কা দিলেন আশানন্ত···নেশার ঝোঁকে সদর্পে তিনি আত্মপ্রচার সুরু করলেন। দেশের যাঁরা গণ্য-মান্য বড় লোক, তাদের কার সঙ্গে কতখানি তাঁর সম্পর্ক, সংযোগ, তার বর্ণনায় আশানন্ত হলেন সহস্র-মুখ! এক কাকার কথা তুলে তিনি বললেন—কাকার মতো প্রতিপত্তিশালী মানুষ রাজ্যে আর নেই! সেই কাকার ভাইপো তিনি! অতএব তাঁর তুলনায় আমরা অতি তুচ্ছ নগণ্য জীব! আমরা যে-শ্রেণীর মানুষ, সে-শ্রেণীর উপর বন্ধুর অবজ্ঞা তাচ্ছল্য কতখানি, তাও অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করে ফেললেন!

তাঁর সে স্পর্দ্ধা আমার সহ্য হলো না। আমি বললুম—শোনো, আমরা যদি এমনি নগণ্য মানুষ, তাহলে আমাদের সংসর্গ ত্যাগ করে তোমার ঐ মান্যবর কাকাকে নিয়েই তো থাকতে পারো! তাঁর ওখানে নেমন্তন্ন যেতে পারোনি? না, তিনি বুঝি বিদেশে গেছেন ভারী-রকম সরকারী কাজে?

আশানন্ত এ কথার জবাব দিলেন না। চুলগুলো কপালে উড়ে উড়ে পড়ছিল—হাত দিয়ে কপালের চুল সরাতে সরাতে তিনি বলতে লাগলেন—

এখানকার এই সব লোক কখনো ভদ্র-সমাজে মিশেছে? কোনোদিন একটি ভদ্র-মহিলার দর্শন পেলুম না এতদিন এখানে আছি, এর মধ্যে!

এই পর্য্যন্ত বলে' কোটের পকেট থেকে একতাড়া চিঠি বার করে'—চিঠির প্যাকেটে টোকা মেরে আশানন্দ বললেন—হুঁঃ, এই এত চিঠি—আমায় লিখেছে এক কিশোরী, জানো? এ কিশোরীর জোড়া খুঁজে পাবে না ত্রিভুবনে!

আশানন্দের শেষের কথায় বন্ধু এবং সেই চতুর্থ ভদ্রলোকটি বিন্দুমাত্র মন দেয়নি—তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছিল।

শেষ-ভরে আমি বললুম আশানন্দকে—আরে থামো, থামো, সুবিখ্যাত মহামান্য-কাকার ভাইপো-মশাই, কি বাজে প্যাকেট ঠুকে চালিয়াতী করছো! ও প্যাকেটে কিশোরীর চিঠি আছে, না, হাতী আছে!

—বটে! আশানন্দ গর্জ্জে উঠলো। একখানা চিঠি খুলে আমার সামনে ধরে' বললে—এটা কি তবে? পুরাণ-গ্রন্থ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোখানা চিঠি খুলে আমায় দেখালো। চিঠিগুলো আশানন্দকেই লেখা। হাতের লেখা পরিচিত মনে হলো। খুব পরিচিত!

আমার মাথায় রক্ত উঠলো ছলাং করে'...বুকে একটু কাঁপনও।...অপরের প্রেম-পত্র দেখতে চাওয়া অভদ্রতা, জানি। কিন্তু সে-হাতের-লেখা দেখে ভদ্রতা আমি ভুলে গেলুম। বুক কাঁপছিল,—সে-কাঁপনকে কোনোমতে দাবিয়ে ঝুঁকে পড়ে আমি আশানন্দের হাতের চিঠি পড়তে লাগলুম।

আশানন্দের বেশ নেশা...নেশার ঝোঁকে চিঠিগুলো ফেলে দিলে সে টেবিলের উপর। দিয়ে বললে—অত কষ্ট করে' পড়া কেন? সন্দেহভঞ্জন করো ভালো করে' পড়ে!

লোভ সামলাতে পারলুম না! পড়লুম একখানা চিঠি···

চিঠিখানা আমার বুকে বিঁধলো তীরের মতো! যে-কিশোরী এ-সব চিঠি লিখেছে আশানভকে, আমি তাকে ভালোবাসি—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, এবং সে-ও আমায় ভালোবাসে বলে জানি···তার ভালোবাসার সম্বন্ধে আমার মনে সংশয়ের বাষ্প নেই! চিঠিখানা লেখা ফরাশী ভাষায়—তার প্রতি ছত্রে অন্তরের কি গভীর অনুরাগ···কি বিপুল সম্ভ্রম!

চিঠিতে সম্বোধন দেখলুম—আমার প্রাণের প্রিয়!···শেষের লাইনে সুমধুর আশ্বাস-বাণী! লেখা আছে···মনে সংশয় রেখো না প্রিয়তম! আমি তোমারই···তুমি ছাড়া আর কারো হবো না ইহ-জীবনে!

বজ্রাহতের মতো আমি নিস্পন্দ···

একটু পরে চেতনা ফিরলো। চেতনা ফেরবামাত্র উঠে দমকা ঝড়ের মতো আমি সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম···

এলুম···পনেরো মিনিট পরে একেবারে আমার নিজের আস্তানায়।

মস্কো থেকে পীটার্সবার্গে এসে জংনিস্কি-পরিবারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বাপ, মা, দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে,—এই নিয়ে এঁদের সংসার। বাপের অনেক বয়স, তবু বেশ শক্ত-সমর্থ। মিলিটারীতে বড় চাকরি করেন। সকালে অফিসে যান; দুপুরে হয় ছুটী। ছুটীর পর বাড়ী এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিদ্রা,—তারপর সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে তাস খেলা। বাড়ীর সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক! গম্ভীর মানুষ! কারো সঙ্গে মেশেন না···কথা কন্‌না। দুনিয়ার পানে চান্ কুঞ্চিত দৃষ্টিতে ···কতকটা উদাস ভাব! পড়বার মধ্যে পড়েন শুধু ভূগোল আর ভ্রমণ-

কাহিনী। শরীর মাঝে মাঝে অপটু হয়···সে-সময় নিজের ঘরে নিঃশব্দে শুয়ে থাকেন। সখের মধ্যে বাড়ীতে বসে কখনো ছবি আঁকেন। যখন ছবি-আঁকা ভালো লাগেনা, তখন পোষা কাকাতুয়া পপ্‌কাকে খোঁচা দিয়ে বিব্রত করেন। স্ত্রীর শীর্ণ শরীর···রোগ তাঁর লেগেই আছে। কালো দুটি চোখ কোটর-গত, নাকটি টিকোলো—সোফাতে বসেই তাঁর দিন কাটে। হাতে সেলাইয়ের কাজ,—হয় ক্যাম্বিশ নিয়ে কুশন-কভার তৈরী করছেন, নয় লেশ্‌ বুনছেন। আমার যা ধারণা—মানে, স্বামীকে তিনি ভয় করে চলেন। কবে যেন তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছেন, এখনো সে-অপরাধের কুণ্ঠা তাঁর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে! বড় মেয়ের নাম বার্বারা—মোটাসোটা গড়ন, গোলাপের মতো রঙ—সুকেশিনী। বয়স আঠারো বছর। কাজ-কর্ম নেই—জানলার ধারে বসে আছে সর্বক্ষণ। বসে বসে পথে লোক-চলাচল দেখে। ছেলে পড়ে এক সরকারী স্কুলে—রবিবার ছাড়া বাড়ী আসে না। সে-ও এই বয়সে চুপচাপ থাকে—কারো সঙ্গে বড় মেশেনা, কথা কয় না। ছোট মেয়ে সোফিয়া। তাকে আমি প্রাণ ভরে' ভালোবাসি। ঠাণ্ডা মেজাজের মেয়ে···মোটে প্রগলভা নয···মধুরভাষিণী·· সুহাসিনী!

জংনিসকিদের বাড়ী যেন নিঝুম পুরী! সব সময় নিথর নিস্তব্ধ। সে স্তব্ধতা ভাঙ্গে শুধু কাকাতুয়া পপ্‌কার চ্যাচামেচি-চীৎকারে। পাড়ার লোক-জন বলাবলি করে, ভাগ্যে ঐ পাখীটা আছে, না হলে মনে হতো, ওদের বাড়ীটা যেন মরা-জন্তুর মিউজিয়ম! বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব আসে খুব কম। বাড়ীর আসবাব-পত্র বলতে— ড্রিং-রুমের দেওয়ালে লাল রঙের কাগজ আঁটা—তার গায়ে মাঝে মাঝে হলদে ছোপ্‌; খাবার ঘরে কখানা সাবেকী চেয়ার···রঙ-ওঠা জীর্ণ কখানা কুশন—গায়ে সুতোয় তোলা কটা ভেড়ার আর কুকুরের নক্সা; দেয়াল-গিরি; এবং

দেওয়ালে টাঙানো পুরোনো কখানা ছবি। এগুলো মনকে বিঁধে বাড়ীর নিস্তব্ধতাকে আরো ভারী করে তোলে!

পীটার্সবার্গে এসে আমি ভাবলুম, এ-পরিবারের সঙ্গে দেখা করা আমার কর্ত্তব্য। প্রথম দিন কি করে এক ঘণ্টা কাটিয়েছিলুম, জানি না। তার অনেকদিন পরে আবার গেলুম। নতুন জায়গা, কারো সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কোনোমতে সময় কাটাবো বলে'—এবং তারপর থেকে প্রায় যেতে লাগলুম। যাবার প্রধান আকর্ষণ হলো সোফিয়া! প্রথমে তাকে তেমন লক্ষ্য করিনি। তারপর তার প্রেমে আমি বিহ্বল বিভোর হলুম। প্রত্যহ যেতুম···তাকে না দেখলে দুনিয়া বিরস মনে হতো।

তন্বী শ্যামা সোফিয়া। মাথায় ঘন কালো একরাশ চুল—বড় বড় দুটি চোখ সব সময়ে যেন অর্দ্ধ-নিমীলিত!···মনে তেজ আছে। সে-তেজে নিজেকে কেমন সম্বৃত সংযত রেখেছে! বিশেষ তার ঋজু অধরপুট··· দেখলে মনে হবে, গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে এবং মনে বেশ জোর আছে। বাড়ীর লোক জানে, সোফিয়া ভয়ানক জেদী···এর বেশী তাকে জানবার প্রয়োজন বাড়ীর লোকের মনে জাগেনি!

মাদাম জৎনিসকি একদিন বললেন—আগ-নালা যেমন যায়, পেছ-নালাও তেমনি! ও ঠিক ওর দিদি কাটেরিনার মতো! জৎনিসকি আর মাদাম···দুজনে বসেছিলেন ড্রয়িং-রুমে, আমি বেড়াতে গিয়েছিলুম···মাদাম বললেন—কাটেরিনাকে তুমি ছাখোনি! তার বিয়ে হয়ে গেছে! সে ককেশসে থাকে। তখন তেরো বছর বয়স, দুধের মেয়ে···সেই বয়সে তার মনে জাগলো ভালোবাসা! বলে বসলো, ওকে ছাড়া আর-কাকেও বিয়ে করবে না। আমরা কত বোঝালুম—তুই এখন বাচ্ছা মেয়ে—দুনিয়ার কি জানিস! এর মধ্যে বিয়ে কি!—তা কি জেদ যে ধরলো—

অবশ্য বিয়ে হলো তার তেইশ বছর বয়সে···তবে সেই ছেলের সঙ্গেই। তাই সোফিয়াকে দেখে ভয় হয়···কি কাণ্ড যে ও-ও করে বসবে!··· ভগবানকে ডাকি, বলি, সুমতি দাও ঠাকুর! এখন ও ষোল বছরে পড়েছে···কিন্তু কী জেদী! যা মনে করবে, তা থেকে এক-ইঞ্চি ওকে ফেরাও দিকিনি, পারবে না!

জংনিসকি নিঃশব্দে বসে শুনলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

সোফিয়ার মনের দৃঢ়তা আর তেজ দেখেই কি আমি মুগ্ধ হয়েছি? না। ওর বাইরেটা শুষ্ক, কল্পনাও সঙ্কীর্ণ,—কিন্তু অন্তরের স্পষ্টতা আর স্বচ্ছতা অসামান্য-রকম,—মনে এতটুকু ক্ষুদ্রতা দেখিনি—তার জন্যই ওকে আমার এত ভালো লাগে! শুধু ভালো-লাগা নয়, ওকে আমি খুব বেশী সম্ভ্রম করতুম। ··মনে হতো, আমাকেও ওর ভালো লেগেছে যেন!··· এখন আশানভকে-লেখা ওর ঐ চিঠি দেখে আমার বুকে যেন বাজ পড়লো! আমার সব আশা বিচূর্ণ হলো! সে তাহলে আমায় ভালোবাসে না? ভালবাসে আর-একজনকে! এ আঘাত অসহ্য হলো!

হঠাৎ এত বড় আবিষ্কার! আরও আশ্চর্য্য হলুম এই ভেবে যে আশানভ ক্বচিৎ কখনো ও-বাড়ীতে যায—তার উপর সোফিয়ার বিশেষ টানও কোনোদিন লক্ষ্য করিনি। আশানভ সুপুরুষ···কহিয়ে-বলিয়ে মানুষ। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দুই চোখ, প্রশস্ত ললাট এবং নবীন গুম্ফে তার মুখখানাও দেখায় কমনীয়। কথা কয় পরিমিত মাত্রায়—চুপচাপই থাকে বেশী! নিজেকে খুব উঁচুদরের মানুষ মনে করে! এ ভাবের এমনি ব্যাখ্যাই আমি করে নিয়েছিলুম। গল্প-সল্প হতো—শুনে আমরা হাসতুম—আশানভের মুখে ক্বচিৎ হাসি ফুটতো। এককালে সে কোন্ রেজিমেণ্টে কাজ করতো এবং কাজে তার খ্যাতির কথাও শুনেছি।

সোফায় হেলে আধ-শোওয়া-ভাবে অনেক কথা ভাবছিলুম। ভাবছিলুম, আশ্চর্য্য, এ আমি লক্ষ্য করিনি! চিঠিতে সোফিয়া লিখেছে,—মনে কোনো সংশয় রেখোনা!···বটে!···কি ওস্তাদ মেয়ে···বাইরে অমন শান্ত নিরীহ···সেটা খোলশ?···আর আমি ওকে···

অভিমান হলো···দুঃখ হলো···রাগ-আক্রোশ···সব-কিছু। শেষে আমি কেঁদে ফেললুম! কি অঝোর ধারা!···সারা রাত সেদিন ঘুমোতে পারলুম না।

পরের দিন···বেলা তখন দুটো···গিয়ে হাজির হলুম জৎনিসকিদের বাড়ী। বাপ বাড়ী ছিলেন না। চিরন্তন প্রথা মতো মাকে সোফায বসে সেলাইযের কাজ করতে দেখলুম না। আগের দিন পিঠা-পার্ব্বণ গেছে···মার খুব খাটুনি হযেছে···মাথা ধরে আছে···মা নিজের ঘরে বিছানায় শুযে পড়েছেন। বার্বারা দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে···দৃষ্টি সেই পথে···সোফিয়া গম্ভীর মনে ঘরে পায়চারি করছে···পপকা-কাকাতুয়াটা তার-স্বরে চ্যাঁচাচ্ছে!

আমায দেখে বার্বারা বললে—এই যে,···খপর কি?·· তারপর নিজের মনেই মৃদুতর কণ্ঠে বললে—ট্রে মাথায় চাষাটা কিভাবে পথে চলেছে···দ্যাখো!

পথের পথিকদের দেখে নিজের মনে বার্বারা এমনি মন্তব্য প্রত্যহই করে—তার স্বভাব! কেউ তাতে কাণ দেয় না।

বার্বারার সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম,—তোমাদের খবর কি? সোফিয়া?···মা?

পায়চারি করতে করতেই সোফিয়া দিলে জবাব,—মা ঘরে শুয়ে আছে।

আমার দিকে চেয়ে বার্বারা প্রশ্ন করলে—কাল পার্ব্বণ গেল, বাড়ীতে কত রকমের পিঠে তৈরী হয়েছিল, তুমি ছিলে কোথায়? এলে না যে?…সঙ্গে সঙ্গে পথের দিকে চেয়ে মন্তব্য—ও তো দেখছি সেই কেরাণীটা…করছে কি ও? এ্যাঁ!

আমি জবাব দিলুম—কাল বেরুবার সময় পাইনি মোটে!

পপকা-কাকাতুয়া চীৎকার করে উঠলো—হুঁশিয়ার!

আমি বললুম—পপকা কি-রকম চ্যাঁচাচ্ছে…ওঃ!

সোফিয়া বললে—দিন নেই, রাত নেই, পপকা সব সময় চ্যাঁচাবে! কাণের পোকা বার করে ছায়!

তারপর তিনজনেই চুপ…অনেকক্ষণ।

বার্বারা চেয়ে আছে পথের দিকে। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, নিত্য ও কি দেখে অমন তন্ময় হয়ে? একঘেয়ে লাগে না?…হঠাৎ বার্বারা বলে উঠলো—আমাদের ফটকে এলো যে…বাঃ!

সোফিয়া বললে—ক?

বার্বারা বললে ত্যাখনা ঐ একটা ভিখিরী…

আলমারি থেকে গোটা-পাঁচেক কোপেক নিয়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে ভিখিরীকে দিলে…দিয়ে জানলার কাছ থেকে সরে এসে মেঝের উপর ধপ্‌ করে বসে পড়লো বার্বারা।

আমি একখানা চেয়ার নিয়ে বসেছি ততক্ষণে। বসে আমি বললুম—কাল খুব ভোজ খেলুম। আমার এক বন্ধু কনস্তানতিন আলেকজান্দ্রিক—সে করেছিল নেমন্তন্ন…(এই পর্য্যন্ত বলে সোফিয়াকে লক্ষ্য করলুম—তার মুখে-চোখে এতটুকু ভাবান্তর দেখলুম না)! আঃ, মদের ব্যবস্থা যা করেছিল—ফোয়ারা ছুটেছিল। আমরা কজনে বসে আটটি বোতল সাফ্‌ করেছি!

সোফিয়া চাইলো আমার পানে। বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি···চেয়ে সোফিয়া বললে—সত্যি ?

—হুঁ। আমি বললুম—ভালো কথা, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় সোফিয়া ?···লোকে বলে, মদ খেয়ে নেশা হলে মানুষ সত্য কথা বলে ···কখনো মিথ্যা বলে না, তাই কি ?

ভ্রূ কুঞ্চিত···সোফিয়া বললে—তার মানে ?

আমি বললুম—কনস্তানতিন আলেকজান্দ্রিক্ হাসিয়ে আমাদের প্রাণ বধের উদ্যোগ করেছিল। কপালে হাত বুলিয়ে পাকা-চালে শোনাচ্ছিল—তাকে সামান্য মানুষ না ভাবি ···তার এক কাকা—বললে, রাশিয়ায় তার কাকার মতো খ্যাতি-প্রতিপত্তি আর কারো নেই।

বার্বারা হা-হা করে হেসে উঠলো।

কাকাতুয়াটা চ্যাঁচাতে লাগলো—পপকা···পপকা···পপকা···

সোফিয়া চমকে ফিরে দাঁড়ালো আমার সামনে। আমার মুখে তার দুচোখের অচপল দৃষ্টি ··তারপর সরস কণ্ঠে সে বললে—আর তুমি কি বললে···মনে আছে ?

লজ্জায় আমার মাথায় গালে রক্ত ছলাৎ করে উঠলো। কোনোমতে আমি বললুম—ঠিক মনে নেই! বোধ হয়, অমনি কিছু আজগুবি কথা বলেছি! সত্যি, মদের নেশা যে ভয়ানক, তা মানতেই হবে। নেশার ঝোঁকে বকতে সুরু করলে মানুষ কত বেফাঁশ-কথা বলে! যে-সব কথা কাকেও বলা উচিত নয়, এমন সব কথাও দিব্যি বলে ফেলে। অথচ নেশা কাটলে সে-বলার জন্য আফ্‌শোষের সীমা থাকে না!

সোফিয়া বললে—মনের তেমন গোপন কথা বললে কেন ?

আমি বললুম—আমার কথা বলছি না আমি।

সোফিয়া সরে গেল; এবং আগের মতোই পায়চারি করতে লাগলো।

আমি তার পানে চেয়ে রইলুম। বুকের মধ্যে আক্রোশের আগুন ধূমায়িত···মনে হচ্ছিল, না, আমার ভুল! শিশুর মতো সরল মন সোফিয়ার! দেখলে মনে হয় না, ভালোবাসার মর্ম্ম বোঝে! ওর মন পাথরের তৈরী! কিন্তু···

হঠাৎ ডাকলুম—সোফিয়া···

সোফিয়া দাঁড়ালো···দাঁড়িয়ে আমার পানে তাকালো।

কোনো কথা বলতে পারলুম না। অথচ মনের দোরে কত কথা ভিড় করে এসে দাঁড়ালো!···

সোফিয়া বললে—ডাকলে?

অপ্রতিভ কণ্ঠে বললুম—হুঁ। একটু সুর শোনবার ইচ্ছা হচ্ছে। একবার বসবে তোমার পিয়ানোর ধারে?···তারপর তোমাকে কিছু বলবো···বলবার মতো কথা আছে।

নিঃশব্দে সোফিয়া গিয়ে বসলো ঘরের কোণে-রাখা পিয়ানোর সামনে ···আমিও তার অনুসরণ করলুম। পিয়ানোর সামনে এসে সোফিয়া দাঁড়ালো। বললে—কি বাজাবো, বলো?

—যা তোমার খুশী···সোপ্যাঁর কোনো রাতের সুর?

পিয়ানোর বসে সোফিয়া তুললো ঝঙ্কার। সুর কেটে কেটে যাচ্ছে—তবু সে বাজাচ্ছে প্রাণের দরদ মিশিয়ে।···বার্বারা তেমন বাজাতে জানে না···দু-চারটে ওয়াল্‌জ্‌ কি পল্‌কা বাজায়, তাও কালে-ভদ্রে!

হঠাৎ অলস চরণে বার্বারা চললো পিয়ানোর দিকে···কাঁধে কোট ঝুলোনো···পিয়ানোর কাছে গিয়ে হাত থেকে কোটটা ফেলে (বার্বারাকে কোট ছাড়া কখনো দেখিনি) পিয়ানোয় বসে গেল···বসেই খুব উঁচু পর্দ্দায় বাজাতে সুরু করলে পল্‌কা। তাই কি শেষ করলে! খানিকটা পল্‌কা বাজিয়ে আর একটা সুর ধরলে···তারপর হঠাৎ মস্ত একটা নিশ্বাস

ফেলে হাই তুলে পিয়ানো ছেড়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। অদ্ভুত বই এই বার্বারা মেয়েটির!

সোফিয়ার কাছ ঘেঁষে চেয়ার টেনে আমি বসলুম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মুখে নিবদ্ধ করে বললুম—একটা বিশেষ খবর তোমায় জানাতে চাই। এ খবর আচমকা শুনেছি।

—খবর!...বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে সোফিয়া তাকালো আমার পানে, বললে—কি খবর?

—বলছি...বলে একটু চুপ করে রইলুম; তারপর একটা উদ্যত নিশ্বাস প্রাণপণে চেপে আমি বললুম—কাল পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা ছিল...কাল জানলুম, সে-ধারণা ভুল!

—মানে?...ভুরু কুঁচকে সোফিয়া পিয়ানোয় সুর বাজাতে লাগলো—চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ নিজের আঙুলে।

আমি বললুম—আমি জানতুম, তুমি স্পষ্ট কথা কও। আমার বিশ্বাস ছিল, তোমার মধ্যে ন্যাকামি নেই, ভণ্ডামি নেই...মনে এক ভাব, আর বাইরে অন্য ভাব দেখানো—তোমার স্বভাবই নয়!

পিয়ানো-যন্ত্রটার উপর যথাসম্ভব ঝুঁকে মৃদু কণ্ঠে সোফিয়া বললে—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না!

আক্রোশ বাড়ছিল। আমার পৌরুষের অপমান! আগুনের ঝাঁঝে মন চিড়বিড় করছিল! বললুম—তা ছাড়া আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তোমার বয়সের মেয়ে অভিনয়-কলায় এতখানি ওস্তাদ হতে পারে!

পিয়ানোর রীডের উপর সোফিয়ার হাত যেন কাঁপলো...আমি লক্ষ্য করলুম!

আমার পানে না তাকিয়েই সোফিয়া বললে—এ-সব কথার মানে?...আমি অভিনয় করি...

—নিশ্চয় !

সোফিয়া হাসলো। আমার আক্রোশ আরো তীব্র হলো। বেশ চড়া গলায় বললুম—হাবে-ভাবে একজনের উপর দারুণ ঔদাস্য দেখাও, অথচ আড়ালে তাকে রাশ-রাশ প্রেমপত্র লেখো !

সোফিয়ার মুখ নিমেষে কাগজের মতো সাদা! আমার পানে সে ফিরেও তাকালো না। কোনো জবাব দিলে না ! আপন-মনে রাতের সুরটা বাজিয়ে শেষ করলে ; তার পর পিয়ানোটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো।

বিহ্বলের মতো আমি প্রশ্ন করলুম—যাচ্ছো যে। আমার কথার জবাব ?

—কি জবাব দেবো ?···তোমার কথার মানে আমি একবর্ণ বুঝলুম না ! তাছাড়া জীবনে ভণ্ডামি বা অভিনয়···কখনো করি না আমি ! ও-দুটো বিদ্যা জানিও না !

সোফিয়া উঠতে যাচ্ছিল···আমার মাথায় রক্ত চড়লো ! আমি বললুম—না বাজে কথা শুনতে চাই না। তুমি খুব ভালো করেই বুঝছো আমার কথা। বলো যদি, তোমার চিঠির একছত্র মুখস্থ···শোনাতে পারি তোমাকে ! তাকে তুমি চিঠিতে লিখেছো—মনে এতটুকু সংশয় রেখো না···

সোফিয়া চমকে উঠলো—যেন সামনে সাপ দেখেছে ! পরক্ষণে বললে—তোমার কাছে এমন আচরণ আমি প্রত্যাশা করিনি !

আমি জবাব দিলুম—আমিও ভাবিনি যে তুমি যে-মানুষকে সবার সামনে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করো, চোখের আড়ালে তার সঙ্গে···

চকিতে আমার পানে ফিরে তাকালো সোফিয়া। আমি একটু সরে গেলুম। সোফিয়ার যে-চোখ চিরদিন অর্দ্ধ-নিমীলিত দেখেছি, সে-চোখ বিস্ফারিত হলো···ডাগর হলো···এবং সে-চোখে যেন আগুনের শিখা···

সোফিয়া বললে—বুঝেছি, তুমি কি বলছো! তাহলে শোনো আমার জবাব···হ্যাঁ, আমি তাকে ভালোবাসি। আর এ-ভালোবাসার সম্বন্ধে তুমি যাই ভাবো, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। তাছাড়া এ নিয়ে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন? আমাকে এমন করে বলবার কি অধিকার আছে তোমার? আমি যদি নিজের মনে ঠিক করে থাকি···

এর পরেই সোফিয়া হঠাৎ হলো নির্বাক···তারপর বেরিয়ে গেল ঝড়ের ঝাপটার মতো! আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলুম···যেন কাঠের পুতুল!

অনেকক্ষণ পরে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলুম। লজ্জায় দু-হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়লুম! বুঝলুম, আমার অনধিকার কতখানি! শুধু অনধিকার নয়—অত্যন্ত দুর্বিনীত হয়েছে আমার আচরণ! অনুশোচনায় গ্লানির ভারে মন আমার অবসন্ন হলো। এত বড় লজ্জা নিয়ে লোকালয়ে মুখ দেখাবো কি করে? ছি ছি, এ আমি কি করলুম!

চমক ভাঙ্গলো দাসীর কণ্ঠস্বরে···দাসী এলো বাইরের যে-ঘরে আমি···সেই ঘরে। আমায় ডেকে বললে—আন্তন সাহেব, শীগগির এক-গ্লাস জল···সোফিয়া নিকোলোভনা···

প্রশ্ন করলুম—সোফিয়া! সোফিয়ার কি হয়েছে?

—তিনি কাঁদছেন।

ছুটলুম ড্রয়িং-রুমে আমার হ্যাট নেবার জন্য।···

বার্বারার সঙ্গে দেখা। বার্বারা বললে—সোফিকে তুমি কি বলেছো?

সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি ফিরলো খোলা জানলা দিয়ে বাইরের পানে—বলে উঠলো—সেই কেরাণীটা! আঃ, ওখানে ঘুরছে কেন ও?

আমি চলে আসছিলুম, বার্বারা বললে—যাচ্ছো যে! বসো···মা আসছে।

আমি বললুম—না, না, বসতে পারবো না। আর এক-সময়ে আসবো'খন।···

ঠিক সেই মুহূর্তে আমায় সচকিত করে' আতঙ্কিত করে সোফিয়া এসে ঢুকলো ড্রয়িং-রুমে। তার মুখ বিবর্ণ···চোখ লাল। আমার পানে সে তাকালোও না!

বার্বারা বললে—গ্যাখ্ রে সোফি···একটা কেরাণী···আমাদের বাড়ীর সামনে ঘুর্‌ঘুর্ করছে।

তাচ্ছল্য-ভরে সোফিয়া বললে—বোধ হয়, স্পাই!

যথেষ্ট! আমি আর দাঁড়ালুম না, বেরিয়ে পড়লুম। কি করে বাড়ী ফিরেছিলুম, জানি না!

গ্লানির ভার অসহ্য! নিজেকে অতি হীন, হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু-দুটো আঘাত।···চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার পৃথিবী চুরমার হয়ে গেল! জানলুম, সোফিয়া ভালোবাসে···আমাকে নয়, আর একজনকে! এবং সোফিয়ার কাছে আসা···সোফিয়ার সঙ্গে সখ্য হারালুম জন্মের মতো! নিজেকে এমন লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত হীন বলে মনে হতে লাগলো যে নিজের উপর ক্রোধ হলো সীমাহীন। ওরে মূঢ়, ওরে নির্বোধ···

সোফায় দেহ-ভার লুটিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে ছিলুম। নিজের দুর্ভাগ্য আর দৈন্যের অতল তলে নেমে চলেছিলুম···এমন সময় শুনলুম কার পায়ের শব্দ! আমারি ঘরে। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, আমার প্রিয়-বন্ধু ইয়াকভ পাশিনকভ।

মনের মধ্যে আগুন জ্বলছিল! মনে হচ্ছিল, এ আগুনে সারা দুনিয়াকে যদি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারতুম! ইয়াকভকে দেখে

কিন্তু তার উপরে রাগ হলো না। তার উপরে রাগ কখনো হয়নি·· তাকে পেয়ে যেন বাঁচলুম!

বসতে বললুম। ইয়াকভ বসলো না, ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো। পায়চারি করা তার স্বভাব···মাঝে মাঝে কেসে গলা সাফ করছিল···হঠাৎ এক সময় আমার পানে তাকালো। দু' চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নিঃশব্দে প্রায় দু' মিনিট—তার পর কোণে একখানা চেয়ার টেনে বসলো।

ছেলেবেলা থেকেই পাশিনকভের সঙ্গে আমার ভাব।···ছেলেবেলায় তার সঙ্গে এক-ক্লাশে পড়েছি···তিন বছর জার্মান উইনটারফেলারের স্কুলে। পাশিনকভের বাবা ছিলেন সামান্য এক মিলিটারী অফিসার··· মেজর···তখন পেন্সন নেছেন। ভারা ধার্মিক মানুষ,—তবে মাথায় একটু ছিট ছিল। ইয়াকভের বয়স তখন সাত বছর,—সেই বয়সেই ইয়াকভের ভার তিনি দেন এই জার্মান মাষ্টারের হাতে—এক বছরের মাহিনা আগাম তাঁকে দিয়ে তিনি চলে যান মস্কো। তার পর থেকে বাপের আর কোনো খবর নেই!···মাঝে মাঝে তাঁর সম্বন্ধে গুজব শুনতুম। আট বছর পরে অকাট্য ভাবে জানা গেল, ইর্তিশ নদী পার হবার সময় নদীতে ভয়ানক বাণ এসেছিল সেই বাণের জলে তিনি ডুবে মারা গেছেন। সাইবেরিয়ায় কেন তিনি গেলেন, ভগবান জানেন! পাশিনকভের আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও ছিল না। মা মারা গেছেন—পাশিনকভের বয়স তখন দু-বছর। কাজেই সে পড়ে রইলো উইনটারফেলারের কাছে। দূর-সম্পর্কের এক ঠাকুমার কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তিনি ভয়ানক গরীব—ইয়াকভকে

দেখবার নাম করতেন না ভয়ে—পাছে নাতির ভার নিতে হয়! ঠাকুমার সে-ভয় ঘুচলো পাশিনকভকে যখন উইনটারফেল্টার নিজের কাছে রাখলেন। তবে পাশিনকভের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না! সকলের খাওয়ার পর যা বাঁচতো, তাই খেয়ে বেচারীকে উদর পূরণ করতে হতো।…রবিবারে শুধু দু-একটা মিষ্টান্ন জুটতো। সে পরতো পরের জীর্ণ-পরিত্যক্ত মর্ণিং-গাউন ছেঁটে তারি টুকরো কেটে জুড়ে সেলাই-করা কোট আর ট্রাউজার। এর জন্য সহপাঠীদের অবজ্ঞারও সীমা ছিল না—সকলে তাকে কৃপার চোখে দেখতো। তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করলেও কিন্তু তারা ভালো বাসতো ইয়াকভকে তার শান্ত-শিষ্ট স্বভাবের জন্য। সকলের উপর তার দরদ—সকলের সেবা-পরিচর্য্যা—পৃথিবীতে এমন দেখা যায় না। লেখাপড়াতেও পাশিনকভ ছিল সবার সেরা।

ইয়াকভের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, তার বয়স তখন ষোল বছর, আমার বয়স তেরো। আমি ছিলুম দারুণ স্বার্থপর…বাপের আদরে যাকে বলে, মাটী-করা ছেলে! ধনী-ঘরের ছেলে আমি…স্কুলে ঢুকেই আমার আলাপ জমলো এক প্রিন্সের সঙ্গে। প্রিন্স ছিল উইনটারফেলারের পেয়ারের ছাত্র। আরো দু-চারটি বোনেদী ঘরের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। চালিয়াতীতে অন্য ছেলেদের আমি চমকে দিতুম। পাশিনকভকে কোনো দিন লক্ষ্য করিনি—লক্ষ্য করবার যোগ্য বলে মনে করিনি তাকে। তার ঐ বেমানান বেশ আর ভৃত্যের মতো তার পরিচর্য্যার রীতি দেখে আমি ভেবেছিলুম, উইনটারফেলারের বয়-চাকর ও। সকলকে মান্য করে সমিহ করে চলতো পাশিনকভ! কারো সঙ্গে মিশবে, এমন সাহস তার ছিল না। কেউ পীড়ন-লাঞ্ছনা করলে নীরবে সে তা সহ্য করতো। আমাকেও সে দেখতো মান্য-গণ্য হিসাবে!

দু-মাস পরে এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে আমরা দল বেঁধে লীপক্রগ্

খেলছিলুম···খেলতে খেলতে আমি এলুম বাগানে,—এসে দেখি, একটা পুষ্প-কুঞ্জের পিছনে বেঞ্চে বসে পাশিনকভ! বসে সে বই পড়ছে। কি বই···দেখবো বলে উঁকি দিতেই মলাটখানা নজরে পড়লো। দেখি, মলাটে লেখা বইয়ের নাম—শীলারের গ্রন্থাবলী। দেখে আমি চমকে উঠলুম! প্রশ্ন করলুম—তুমি জার্মান জানো?

আমার সে-স্বরে যে শ্লেষ, যে স্পর্দ্ধা আর অবিনয় প্রকাশ পেয়েছিল, সে কথা মনে হলে আজো আমি লজ্জায় নুয়ে পড়ি!···পাশিনকভ তার ডাগর দুটি চোখ তুলে আমার পানে চাইলো—কি স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি সে চোখে!

বললে—হ্যাঁ।···তুমিও জানো···জার্মান?

এ-প্রশ্নে মনের কোন্খানে যেন অপমানের কাঁটা বিঁধলো···বললুম—জানি বলেই তো বিশ্বাস!···কথাটা বলে চলে আসছিলুম···হঠাৎ কি মনে হলো, প্রশ্ন করলুম—শীলারের কোন্ বইখানা পড়ছো?

সে বললে—আমি পড়ছি 'উৎসর্গ' কবিতা। চমৎকার···নয়? পড়বো ···তুমি শুনবে? বসো না এই বেঞ্চে···আমার পাশে।

চকিতের জন্য ইতস্তত ভাব—তার পর বসলুম। পাশিনকভ পড়তে লাগলো কবিতা। আমার চেয়ে ঢের ভালো করেই ও জার্মান জানে। অনেকগুলো লাইনের মানে আমাকে চমৎকার করে' বুঝিয়ে দিতে লাগলো। তবু আমার নিজের মূঢ়তায় এতটুকু লজ্জা নেই! আমার চেয়ে কত ভালো তার পড়াশুনা, সে-বিবেচনাও নেই!

সেই দিন থেকে আমি হলুম তার পড়ায় সঙ্গী! প্রতিদিন সেই পুষ্প-কুঞ্জের পিছনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা দুজনে এসে বেঞ্চে বসতুম। বসে পড়তে লাগলুম! অন্তর দিয়ে পাশিনকভকে আমি ভালো বাসলুম—তাকে আমার সাথী, অকপট বন্ধু বলে গ্রহণ করলুম।

তখনকার তার সেই চেহারা আর বেশ-ভূষা···আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে।···পরে তা বিশেষ তেমন বদলায়নি! দীর্ঘ দেহ···রোগা মানুষ · দেহের গড়নে কোনো সামঞ্জস্য নেই! খাটো কাঁধ, লম্বা গলা—দেখাতো রুগ্নের মতো! আসলে কিন্তু ছিল স্বাস্থ্যে ভরপুর। মাথার চুল পরিপাটি নয়। লাল নাক···একটু বেশী লম্বা, কপাল কিন্তু বেশ চওড়া, আর দুটি চোখে স্বচ্ছ মনের দরদ-প্রীতি সব-সময়ে জ্বলজ্বল করছে। তাকে দেখলে আনন্দ হয়···আর্ত মন আরাম পায়! তার কণ্ঠস্বর কোমল,—সহজ-সৌজন্যে সুমধুর! সে যখন 'সাধুতা', 'সত্য', 'জীবন', 'বিজ্ঞান', 'ভালোবাসা' কথাগুলো উচ্চারণ করে,—যত উৎসাহ-ভরেই উচ্চারণ করুক, তা একেবারে তীরের মতো মর্ম্মে গিয়ে বেঁধে! সে কথাগুলোকে এতটুকু হাল্‌কা বা মিথ্যা বলে মনে হয় না! জীবনে তার মস্ত আদর্শ আছে এবং নিঃশব্দে ধীর শান্ত নিরাড়ম্বর সহজ গতিতে সেই আদর্শ লক্ষ্য করে সে যেন চলেছে! মন আশ্চর্য্য স্বচ্ছ নির্ম্মল! পাশিনকভ আদর্শবাদী। আমাদের যুগে এমন মানুষ আমি প্রত্যক্ষ করিনি। একালে আদর্শবাদীর দেখা মেলে না—ও সব মানুষ যেন দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! আমাদের তরুণ সমাজে 'আদর্শ' কথাটা মূঢ়তা-অর্থে প্রয়োগ করি··এ যুগের যুবজনের ভাগ্য মন্দ, সন্দেহ নেই।

তিন বছর এই পাশিনকভ আর আমি এক স্কুলে একই ক্লাশে পড়েছি। দুজনে ছিলুম হরিহর-আত্মা। প্রণয়-ভালোবাসার কথা আমাকেই সে বলেছিল। মনে কী গর্ব্বই না বোধ করে ছিলুম! কী কৃতজ্ঞ দরদ-ভরা চিত্তে আমি সে কাহিনী শুনেছিলুম! তার সত্য-পণের কথাও শুনে-ছিলুম। একাগ্র মনোযোগে সে ভালোবেসেছিল উইনটারকেলারের এক ভাগনীকে। শিশুর মতো সরল-চিত্তা কিশোরী···তার নীল দুটি চোখ!

সেও ভারী শান্ত। দয়া-মায়ায় পূর্ণ তার প্রাণ, আর মুখের ভাষা ছিল সুরের মতো মিষ্টি।

পাশিনকভ তাকে ভালোবাসতো নীরবে···মনে-মনে! উচ্ছ্বাসে সে ভালোবাসা প্রকাশের মোহ তার ছিল না। রবিবারে-রবিবারে শুধু তাকে চোখে দেখতো—উইনটারফেলারের ছেলেমেয়েদের কাছে ভাগনীটি আসতো খেলা করতে। পাশিনকভের সঙ্গে তার কথা হতো খুব কম! একবার সে পাশিনকভকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে ডেকেছিল···সে-ডাকের আনন্দে পাশিনকভের চোখে সে-রাত্রে ঘুম আসেনি! এ কথা বেচারীর মনে হয়নি যে স্কুলের সব ছেলেকেই মেয়েটি 'বন্ধু' বলে! আমার বেশ মনে আছে, যেদিন আমরা প্রথম শুনলুম—ফ্রাউলিন ফ্রেডারিকার বিয়ে হবে শীঘ্র সঙ্গতিপন্ন মাংসওয়ালা হের নিফটাসের সঙ্গে···হের নিফটাস দেখতে বেশ সুপুরুষ এবং তার অঢেল টাকা—সেদিন পাশিনকভ আঘাতের বেদনায় কী-রকম হয়ে গিয়েছিল! তাছাড়া অভিভাবকদের কথায় ভাগনী তাকে বিয়ে করছে—হের নিফটাসের উপর গভীর ভালোবাসার জন্য নয়। এ আঘাত আরো বেশী বাজলো···যেদিন বিয়ের পর নব-দম্পতী এলো উইনটারফেলারের বাড়ীতে নেমন্তন্ন। সেদিনও ফ্রাউলিন তার স্বামীর কাছে পাশিনকভকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পাশিনকভ গভীর আবেগে হের নিফটাসের কর-কম্পন করে দুজনের দীর্ঘ আয়ু এবং সীমাহীন সুখ-শান্তির কামনা জানিয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল আমাদের সামনে।···ইয়াকভের উপর সেদিন আমার শ্রদ্ধা হয়েছিল অপরিসীম! তারপর এ নিয়ে দু-একটা দুঃখের কথাও আমাদের হয়েছিল। পাশিনকভকে আমি বলেছিলুম, —আর্ট সাধনা করো!

সে জবাব দিয়েছিল—হুঁ···কবিতা লিখবো।

আমি বলেছিলুম—প্রিয় বন্ধুই থেকো চিরদিন···সকলের।

পাশিনকভ জবাব দিয়েছিল—হুঁ, প্রিয় বন্ধুই থাকবো।

আঃ, কি সুখের দিনই না ছিল সে সব!

তারপর স্কুল ছাড়বার সময়···পাশিনকভকে ছাড়তে হবে এই ভেবে আমার মন ব্যথায় দুমড়ে পড়েছিল। সে চেষ্টা করছিল, বিস্তর লেখালেখি করে' নিজের জন্য সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে' ইউনিভার্সিটিতে যাতে ঢুকতে পারে! আমি যেদিন স্কুল ছেড়ে আসি, তার আগের দিন সে সার্টিফিকেট পায়। উইনটারফেলারের এখানে তারি খরচে সে বাস করছিল,—তবে ইদানীং বেশভূষায় সে-দুর্দ্দশা আর ছিল না! কটি ছাত্র পড়িয়ে যৎসামান্য যা রোজগার করতো, তাতেই তার পোষাক-আশাকের ব্যয় নির্ব্বাহ হতো! ছাত্রগুলিকেও লেখায়-পড়ায় আচারে ভব্যতায় সে যা তৈরী করছিল,···দেখে আমার হিংসা হতো। এ নিয়ে আমাদের দুজনের বয়সের পার্থক্য বেশ উপলব্ধি করতুম! বন্ধুত্বের প্রীতির উপর তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে লাগলুম। তার আদর্শ আমার মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে পাশিনকভের সামনে আমার মুখে মিথ্যা কথা আভাসেও প্রকাশ পেতো না। তার সঙ্গে একা বেড়াতে আমার বড় ভালো লাগতো। বেড়াতে বেড়াতে পাশিনকভ কত ভালো ভালো কবিতা আবৃত্তি করতো; ভালো ভালো কত কবিতার অর্থ আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিত। শুনতে শুনতে মনে হতো, আমি যেন পৃথিবীর মাটী ছেড়ে কোন্ স্বপ্ন-জগতে চলেছি!···সে জগৎ বিচিত্র বিরাট!

একটা রাতের কথা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সেই পুষ্প-কুঞ্জের ধারে বসে আছি দুজনে···সে-জায়গাটি ছিল

যেন আমাদের স্বর্গ! বন্ধু আর সাথীর দল তখন ঘুমিয়েছে, আমরা দুজনে গায়ে গরম কোট চড়িয়ে সেখানে গেলুম···পা টিপে টিপে··· অতি নিঃশব্দে। অন্ধকার রাত্রি। গেলুম সেই পুষ্প-কুঞ্জের ধারে স্বপ্ন রচনা করতে। রাত্রিটা তেমন ঠাণ্ডা ছিল না—বেশ মিষ্টি বাতাস বইছিল···দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি বসলুম। বসে কথার আর অন্ত নেই··· সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন-তত্ত্ব সব নিয়েই কথা হচ্ছিল···সে কথায় প্রাণের আবেগ ঢেলে দিয়েছি দুজনে—তর্ক নয়, যুক্তি নয়, স্বপ্নাবেশের ভাব! চাঁদ নেই···মাথার উপর এক-আকাশ নক্ষত্র! ইয়াকভ হঠাৎ চাইলো আকাশের পানে···অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো···তারপর আমার হাতখানা ধরে' কবিতা আবৃত্তি করলে শান্ত আবেগ-ভরা কণ্ঠে—

আমাদের মাথার উপর
শুদ্ধ নীলাম্বর!
লক্ষ-লক্ষ তারা সে-অম্বরে
বিরাজিছে যুগ যুগ ধরে'!
আরো ঊর্দ্ধে—নক্ষত্রের প্রদীপ্ত শিখরে
সর্ব্বস্রষ্টা···

আমার সর্ব্ব-শরীরে রোমাঞ্চ···আকাশের পানে চাইলুম···দেহ-মন পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এলো—পাশিনকভের কাঁধে আমি মাথা রাখলুম। মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল···আনন্দেরসে এক অপূর্ব্ব শিহরণ!···হায়, কোথায় আজ সে অকলুষ যৌবন!

স্কুল ছাড়বার আট বছর পরে পীটার্সবার্গে পাশিনকভের সঙ্গে আবার আমার দেখা। সত্য তখন সরকারী চাকরিতে ঢুকেছি এবং কোন্

মুরুব্বির দৌলতে পাশিনকভও কি-একটা ডিপার্টমেণ্টে পেয়েছে সামান্ত চাকরি।

সে-দেখায় দুজনেই আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠলুম! সেদিনের কথা ভোলবার নয়···বাইরে একা বসে আছি···চুপ-চাপ···হঠাৎ বাড়ীর প্যাসেজে ধ্বনিত হলো পাশিনকভের চির-পরিচিত কণ্ঠ।

চমকে উঠলুম। তারপর কম্পিত বুকে ছুটে বাইরে এলুম···এসে দেখি, পাশিনকভই!

ঝাঁপিয়ে পড়লুম তার বুকে···তাকে তার ওভারকোট আর গলায় জড়ানো স্কার্ফখানা খোলবার অবসর না দিয়ে তার পানে চেয়ে রইলুম··· নির্ব্বাক···নিস্পন্দ! আমার দু'চোখ বাষ্পে ভরে' আর্দ্র হয়ে এলো। সাত বছরে তার বয়স যেন পনেরো বছর বেড়ে গেছে, মনে হলো! সেই মুক্ত স্বচ্ছ ললাটে কে যেন অসংখ্য গভীর রেখা এঁকে দিয়েছে! গালে কোঁচ্ পড়েছে···মাথার চুল আরো পাতলা হয়ে গেছে। অল্প-অল্প দাড়ি···ঠোঁটের হাসিটুকু কিন্তু তেমনি অমলিন! সে-হাসিতে তার প্রাণের সেই অকপট প্রকাশ!

তারপর···কত কথাই না হলো দুজনে! ভালো ভালো কবিতা পড়া হলো। তাকে অনেক মিনতি জানিয়ে বললুম,—একলা থাকি, তোমার বাসা ছেড়ে এখানে চলে এসো ইয়াকভ্, দুজনে এক-সঙ্গে থাকবো।

কিছুতে তাকে রাজী করাতে পারলুম না···তবে এইটুকু রাজী হলো, বললে সে রোজ আসবে···এবং এ-কথা সে রক্ষা করেছিল।

চেহারায় অতখানি পরিবর্ত্তন হলেও মন কিন্তু তার ঠিক তেমনি আছে—চিরদিনের সেই আদর্শবাদী মন! জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা···কটু-তিক্ত অভিজ্ঞতা···নৈরাশ্য বুকটাকে পুড়িয়ে শ্মশান করে' দেছে—তবু

কিশোর মনে যে-ফুলটি সে ফুটিয়েছে, সে-ফুল তেমনি অম্লান অক্ষয় শুভ্র নির্ম্মল আছে! এত ঝড়-ঝঞ্ঝায় সে ফুলের একটি পাপড়ি ঝরে যায়নি··· একটি ফুলও মলিন হয়নি। তার হাবে-ভাবে কথায় চেহারায় বিষাদের চিহ্ন নেই! চিরদিনের শান্ত···ধীর পুলক-হাস্যময় পুণ্য-কান্তি সেই পাশিনকভ্!

পীটার্সবার্গ তার কাছে যেন মরুভূমি! এখানে কাকেও সে জানেনা—ভবিষ্যৎ বলে' তার কিছু নেই! আমি তাকে টেনে জৎনিসকিদের ওখানে নিয়ে গেলুম। তারপর থেকে প্রায় সে সেখানে যেতো। আত্মসর্ব্বস্ব নয় বলে' তার লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না এতটুকু··· তবে সর্ব্বত্র যেমন, সেখানেও সেই চুপচাপ থাকা! কথা কয় অল্প··· নেহাৎ প্রয়োজনে! সবাই ওকে ভালোবাসতো। বাড়ীর অত-বড় গম্ভীর কর্ত্তা···তাকে বন্ধু বলে মনে করতেন। আর মেয়েদুটি ওর সঙ্গে মিশতো আপন-জনের মতো।

একদিন জৎনিসকির ওখানে পাশকিনভ এসে হাজির হলো, পকেটে দু-একখানা বই নিয়ে। এসে অনেকক্ষণ কেমন থমথমে দৃষ্টিতে সকলের পানে তাকাতে লাগলো, মুখে একটিও কথা নেই।···বইখানা পড়বে, কি, পড়বে না···যেন ঠিক করতে পারছে না! তারপর হঠাৎ কোণের দিককার একখানা চেয়ারে বসলো গিয়ে। এদিকে তখন খুব গল্প চলেছে হয়তো, ও গিয়ে চেয়ারে বসে বই পড়তে লাগলো। প্রথমে মনে মনে পড়া···নিঃশব্দে···তারপর কণ্ঠ হতো স্পষ্ট···অবশেষে কণ্ঠ উঠতো উচ্চে, আবেগে ভরে'···সকলের অস্তিত্ব ভুলে ভাবাবেশে সে পড়ে যেতো··· পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতো তার মন্তব্য আর সমালোচনা! আমি লক্ষ্য করেছি, বই খুলে তার বসা ইস্তক বার্বারার মন সব ছেড়ে তার দিকে উদগ্র হতো···তারপর ইয়াকভের কণ্ঠে ভাষা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে বার্বারা

উঠে যেতো তার কাছে এবং তার পাশেই চেয়ারে বসে তন্ময় হয়ে তার সে-পড়া শুনতো। বইয়ের মর্ম্ম যে সে খুব বুঝতো তা নয়, তবে এমনি ঝোঁক লক্ষ্য করেছি বার্বারার! বার্বারার সে তন্ময় ভাব আমি আজো ভুলিনি। দু'চোখের একাগ্র দৃষ্টি পাশিনকভের মুখে নিবদ্ধ… হাতের উপর চিবুকের ভর রেখে বেঁকে বসা—মুখে একটি কথা নেই—মাঝে মাঝে শুধু একটা করে' দীর্ঘনিশ্বাস। কোনো কোনোদিন, বিশেষ করে' রবিবারে আর ছুটীছাটার দিনে আমরা সকলে মিলে 'ফরফিট' খেলতে বসতুম…এ খেলায় আরো দুটি মহিলা এসে যোগ দিতেন। বেঁটে মোটা চেহারা—বয়সে কিশোরী—দুই বোন—জৎনিস্কির সঙ্গে কি একটা দূর-সম্পর্ক ছিল, মিলিটারী-স্কুলের চার-পাঁচটি ছাত্রও এসে জুটতো। ছাত্রগুলি বেয়াদব বা অশান্ত নয়, ভালো। পাশিনকভও এ খেলায় বসতো সব সময়ে গৃহিণী তাতিয়ানার পাশে এবং তাঁর সঙ্গে বিচার-সিদ্ধান্ত করতো। খেলা হলে যে হারবে, কি ভাবে সে হারের খেশারৎ দেবে, তারি বিচার করতো।

ফরফিট খেলার চলিত-রীতি, যে হারে, তাকে চুমু দিতে হয় খেলুড়ীদের সকলকে। সোফিয়া ছিল এই চুমু দেবার বিরোধী। বার্বারা হেরে গিয়ে খুব চট্‌তো,—চটে কখনো মুখ গোঁজ করে চুমু দিত সকলকে…কখনো-বা আবার হাসতে হাসতে চুমু বিতরণ করতো।—সব মেয়েদের মুখেই হাসির তরঙ্গ উথলে উঠতো। আমার কিন্তু বিশ্রী লাগতো! পাশিনকভ শুধু মৃদু-মৃদু হাসতো আর মাথা নাড়তো। বৃদ্ধ কর্ত্তা আমাদের এ-খেলায় কখনো যোগ দিতেন না…তাঁর ঘর থেকেই তিনি খেলা দেখতেন…কিন্তু খুব অপ্রসন্ন মুখে। একবার শুধু তিনি এসে আমাদের খেলার আসরে প্রস্তাব করলেন যে যে হারবে, তাকে ওয়াল্‌জ্‌-নাচ নাচতে হবে তাঁর সঙ্গে! সকলেই রাজী।…সেবারে হলো কি, গৃহিণী

তাতিয়ানা হেরে গেলেন। সকলে লাফিয়ে উঠলো,—নাচতে হবে, ওয়াল্‌জ্‌-নাচ নাচতে হবে তোমায়! গৃহিণী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন··· পনেরো বছরের ব্রীড়াময়ী কিশোরীর মতো! কর্ত্তা ছাড়বার পাত্র নন— সোফিয়াকে বললেন—পিয়ানোয় বসো গিয়ে। সোফিয়া গিয়ে পিয়ানোয় বসলো। কর্ত্তা তখন সরম-কুন্ঠিতা গৃহিণীকে নিয়ে দু-রাউণ্ড ওয়াল্‌জ্‌-নাচ নাচলেন। তাঁদের নাচ শেষ হলে সোফিয়া উঠছিল পিয়ানো ছেড়ে, বার্বারা দিলে না উঠতে, বললে—বাজা, বাজা···এ কথা বলে' বার্বারা গিয়ে পাশিনকভের সামনে নিজের হাত প্রসারিত করে বললে—আসুন, আমরা নাচি···এক রাউণ্ড অন্ততঃ!

পাশিনকভ্‌ বিস্ময়ে বিহ্বল। চকিতের জন্য। তার পর ক্ষিপ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বার্বারার কোমর জড়িয়ে ধরে' নাচতে চললো। দু'পা যেতেই কিন্তু পা পিছলে পড়ে' গেল বেচারী। কাকাতুয়ার খাঁচা ছিল উঁচু একটা টেবিলের উপর···পাশিনকভ পড়লো সেই টেবিলের গায়ে···পাখীর খাঁচাটা গেল পড়ে। কাকাতুয়া তুললো তার-স্বরে চীৎকার—হুঁসিযার···হুঁসিয়ার রবে! আমরা অট্টহাস্যে ফেটে পড়লুম···নাচার পর জৎনিসকি নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন, বিপর্য্যয় কলরব শুনে তিনি এলেন ছুটে—এসেই আবার চলে গেলেন, এবং নিজের ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ করে' দিলেন।···

এর পর থেকে এ-কথা তুলে বার্বারা প্রায় বলতো—পাশিনকভ্‌ কি ভয়ানক ফন্দী করে' নাচটা এড়িয়ে গেলেন···পাছে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় ওঁর···তাই, নয়?

গান-বাজনার উপর পাশিনকভের ছিল আশ্চর্য্য অনুরাগ।···প্রায় সে সোফিয়াকে ধরে ভালো ভালো গৎ শুনতো। সোফিয়া পিয়ানো বাজাতো আর পাশিনকভ তার পাশে বসে তন্ময় হয়ে শুনতো—মাঝে

মাঝে পিয়ানোর সুরে গুণ গুণ করে' গানও ধরতো। শুবার্টের কনষ্টেলেশন শুনলে সে যেন দুনিয়া ভুলে যেতো! বলতো,—শুনতে শুনতে মনে হয় আকাশ থেকে বর্ষার ধারার মতো যেন আলোর হাজার হাজার রঙীন রশ্মি আমার দেহে মনে ঝরে পড়ছে!…এখনো নির্মেঘ নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্রের দীপ্তি দেখলে আমার মনে পড়ে শুবার্টের সেই সুর আর পাশিনকভের বিহ্বল আবেশ!

একবার গ্রাম দেখতে বেরিয়েছিলুম—সে-কথাও আমার স্মৃতির পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। দুখানা বড় গাড়ী করে' বেরিয়েছিলুম আমরা পুরো দল! পার্গোলোভায় গিয়েছিলুম। গাড়ী দুখানা নিয়েছিলুম ভ্লাদি-ভস্তক থেকে। পুরোনো গাড়ী…নীল-রঙ-করা…স্প্রিংওয়ালা…প্রকাণ্ড একটা বাক্স-পাতা আসন আর ভিতরে রাশীকৃত খড় বিছুনো। ঘোড়া-গুলো বাদামী রঙের · অস্থিসার দেহ · দেখলে মনে হয় আধা-রোষ্ট করে' কে তাদের ছেড়ে দেছে! ঘোড়াগুলো খুব মন্থর গমনে এগুচ্ছিল। পার্গোলোভার কাছাকাছি যে পাইনের জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মুখে আমরা এক দোকানে নেমে মাটীর ভাঁড়ে করে' দুধ খেলুম · বুনো ষ্ট্রবেরি আর চিনি খেলুম। পরিষ্কার ঝরঝরে আকাশ। দীর্ঘ-ভ্রমণে বার্বারা কেমন হাঁফিয়ে ওঠে! একটু গিয়েই সে যেন খেঁকিয়ে ওঠে ··দেখেছি আগে অনেকবার! এবারে কিন্তু কি খুশী তার মন! গাড়ী ছেড়ে যখন আমরা গাঁয়ের হাঁটা পথ ধরবো, তখন কে তামাসা করে' বলেছিল—তুমি তো রেগে উঠবে এবার। হাঁটতে হবে…কাঁচা রাস্তা! তার চেয়ে গাড়ীতে বসে থাকো, আমরা ঘুরে আসি। এ-কথায় সে ফোঁশ করে উঠলো।·· তার পর দিব্যি চললো। খানিক দূর চলার পর বনে দুটি চাষার মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়ে দুটিকে ডেকে বার্বারা বসলো এক

গাছ-তলায়। সোফিয়া দেখলো, দেখে হাসলো কিন্তু ওদের ধারেও ঘেঁষলো না। জৎনসকি বললে,—ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না! বার্বারা চলতে পারছে না—কিন্তু স্বীকার করাও দিকিনি!

আমরা বললুম—লাভ কি ওকে লজ্জা দিয়ে? সকলে মিলে একটু বসা যাক না হয়।

এ-কথায় সকলে একটু ফাঁক-ফাঁক হয়ে বসলুম। পাশিনকভ আর আমি বসলুম পাশপাশি। চাষার মেয়েদের সঙ্গে কথা কইলেও বার্বারার দৃষ্টি ক্ষণে-ক্ষণে পাশিনকভকে ছুঁয়ে চলেছে—আমার নজর এড়ালো না।

হঠাৎ এক-সময় বার্বারা উঠলো, উঠে সে আমাদের কাছে এলো ·· পাশিনকভকে উদ্দেশ করে' বললে—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে ইয়াকভ্...

কি কথা তার ছিল—তা কিন্তু কোনো দিনই আর বলা হয়নি... অজানা রয়ে গেছে!

কিন্তু সে পুরোনো কথা যাক...যা বলছিলুম...এখনকার কথা:

পাশিনকভকে দেখে আমি খুব খুশী হলেও...কাল যে-কীর্ত্তি করেছি, তা মনে করে লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলুম। দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলুম...নির্বাক।

একটু পরে আমার পিঠে হাত রেখে পাশিনকভ বললে—শরীর খারাপ?

কোনোমতে জবাব দিলুম—না, শরীর খারাপ নয়...তবে মাথা ভয়ানক ধরেছে।

পাশিনকভ আর কোনো প্রশ্ন করলে না...টেবল্ থেকে একখানা বই তুলে নিলে।

এক-ঘণ্টা নিঃশব্দে কাটলো···আমার বুকের মধ্যে সাগরের ঢেউ বইছিল উত্তাল হয়ে। সব কথা ইয়াকভকে বলবো স্থির করেছি, এমন সময় আমার ফ্লাটের বাহিরে দরজার ঘণ্টা বাজলো।

কে যেন দিলে সিঁড়ির দরজা খুলে···আমি কান পেতে রইলুম··· আশানভের কণ্ঠ শুনলুম। আশানভ জিজ্ঞাসা করলে আমার ভৃত্যকে, আমি ঘরে আছি কি না।

শুনে পাশিনকভ উঠে দাঁড়ালো। আশানভের জন্য তার কোনো দায়-দাবী ছিল না—দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে বল্লে— বিছানায় শুয়ে পড়ো চট্ করে'···মুড়ি দাও···আমি দেখছি বাইরে গিয়ে।

এ-কথা বলে' পাশিনকভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট-খানেক পরে আশানভ ঘরে ঢুকলো।

তার মুখ রাঙা···চোখে ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টি। দেখে বুঝলুম, বিনা-কারণে আশানভ আসেনি!···বুকখানা ধক্ করে' উঠলো! এখন কি করি?···আমি নিস্পন্দ।

একখানা আর্মচেয়ারে বসে আমার মুখে কঠিন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' আশানভ বললে—আপনার কাছে এসেছি এক গুরুতর সমস্যার মীমাংসার জন্য।

—সমস্যা!···কে যেন আমার কণ্ঠ চেপে ধরলে···স্বর কেঁপে উঠলো।

—প্রথম কথা, আপনি ভদ্রলোক কি না?

রাগে জ্বলে উঠলুম! ভ্রূ কুঞ্চিত করে রূঢ় স্বরে বললুম—আপনার এ কথার অর্থ?

—অর্থ এখনি বুঝবেন···অধীর হবেন না। আশানভের স্বরে তীক্ষ্ণ শ্লেষ! আশানভ বললে—কাল নেশার ঝোঁকে আপনাকে কখানা চিঠি

দেখিয়ে ছিলুম···সে চিঠি আমাকে একজন লিখেছিলেন।···আর আজ সে-লোককে চোখ রাঙিয়ে আপনি সেই চিঠির কথা শুনিয়ে তিরস্কার করেছেন! শ্লেষ-বিদ্রূপ করেছেন···সে চিঠির লাইন মুখস্থ বলে'!··· কি অধিকারে আপনি এ-কাজ করেন, জানতে চাই আমি। এর কৈফিয়ৎ?

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। আমি বললুম—আমিও জানতে চাই, কি অধিকারে আমায় আপনি জেরা করেন!

সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল···বললুম—আপনার খুড়োকে নিয়ে আর চিঠিপত্র নিয়ে আপনি ফন্দী চালবাজি যত খুশী করতে পারেন, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।···আপনার চিঠি সব পেয়েছেন তো?

সে বললে—চিঠি ঠিক আছে···কিন্তু কাল নেশার ঘোরে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, তাতে আপনি সহজেই···

বাধা দিয়ে আমি বললুম···বেশ চড়া গলায় বললুম—কোনো কথা নয় মশাই, বেরিয়ে যান আপনি আমার ঘর থেকে। এখনি! আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না···কোনো কৈফিয়ৎ দেবোনা আমি। যে আপনাকে চিঠি লিখেছে, গিয়ে তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চান্।

এ কথায় আশানন্ত যে-দৃষ্টিতে আমার পানে চাইলো, সে-দৃষ্টিতে যেমন ঘৃণা, তেমনি শ্লেষ···আমি তখন রাগে কাঁপছি, পায়ের তলায় পৃথিবী দুলছে!

আশানন্ত উঠে দাঁড়ালো···আমার মুখে নিবদ্ধ সেই দৃষ্টি···তারপর গোঁফটা একটু মোচড়ালো···বললে—আমি বুঝেছি···আপনার মুখের ভাব দেখে আপনার ভদ্রতার পরিচয় পেয়েছি।···তবু বলে যাই, ভদ্র সমাজে মেশবার আগে ভদ্র হবেন···চুরি করে' পরের চিঠি পড়া আর

সে চিঠি পড়ে একজন কিশোরী ভদ্র-মহিলাকে অপমান করা··· অতি-নীচের কাজ।

মেঝেয় পা ঠুকে আমি গর্জ্জে উঠলুম—আপনি···আপনি···আমি আপনার কোনো কথার জবাব দেবো না। দরকার বোঝেন, আমাকে আপনি ডুয়েলের চিঠি পাঠাবেন।

শ্লেষের স্বরে আশানভ বললে—আমি কি করবো তা আমি নিজে জানি · দয়া করে ও-পরামর্শ না দিলেই বাধিত হবো।

আশানভ চলে গেল। আমি সোফায় পড়ে দু-হাতে মুখ ঢাকলুম···

কতক্ষণ এমনি ছিলুম জানিনা, হঠাৎ আমার কাঁধে কার কোমল স্পর্শ অনুভব করলুম। মুখ থেকে হাত সরালুম। দেখি, নিঃশব্দে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পাশিনকভ!

শান্ত সহজ কণ্ঠে পাশিনকভ প্রশ্ন করলে—এ-কথা সত্য? · তুমি পরের চিঠি পড়েছিলে?

জবাব দেবার সামর্থ্য আমার ছিল না—মাথা নেড়ে জানালুম, হাঁ।

পাশিনকভ গেল জানলার ধারে···আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলো·· নিস্পন্দ···

অনেকক্ষণ। তার পর পিছন ফিরেই বললে—একটি মেয়ে চিঠি লিখেছেন আশানভকে···বুঝলুম। মেয়েটি কে?

আদালতে আসামী যেন জজের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে···তেমনি ভাবে আমি বললুম—সোফিয়া জৎনিসকি।

পাশিনকভ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো।···

তার পর নিশ্বাস ফেলে বললে—প্রচণ্ড অভিমান ··বুঝেছি! · তুমি ভালোবাসো জৎনিসকির ছোট মেয়েকে?

—বাসি।

আবার কিছুক্ষণ পাশিনকভ নীরব। তারপর আর একটা নিশ্বাস ফেললে, ফেলে বললে—আমি ঠিক আন্দাজ করেছি!…আজ তুমি তার ওখানে গিয়ে তাকে ভৎর্সনা করেছো?

নিরুপায় কণ্ঠে বললুম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ…আমাকে তুমি খুব ঘৃণা করচো তো!

পাশিনকভ নিরুত্তরে পায়চারি করলে…দু' মিনিট!—তার পর প্রশ্ন করলে—কিন্তু সোফিয়া ভালোবাসে ওকে?

মন্ত্র-চালিতের মতো বললুম—হুঁ, সোফিয়া ওকে ভালোবাসে।

পাশিনকভ আনত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো…নীরবে…অনেকক্ষণ। পরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—বটে…এখনি মীমাংসা দরকার। এ ব্যাপার তুচ্ছ করবার নয়।

পাশিনকভ তার হ্যাটটা নিলে তুলে।

বললুম—কোথা যাচ্ছো?

—আশানভের কাছে।

সোফা ছেড়ে খাড়া আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম। বললুম—না, না, তোমাকে আমি সেখানে যেতে দেবোনা।

পাশিনকভ আমার পানে চেয়ে রইলো…কোনো কথা বললে না।

আমি বললুম—কি বলে যাবে? কাকে কি বলবে?

আমার পানে চেয়ে পাশিনকভ বললে—অভিমান করে' বোকামি করে থাকো যদি, সে বোকামি পুষে রাখবে? এতে তোমার কতখানি ক্ষতি ভাবো তো! তাছাড়া তার অপমান…

—কিন্তু গিয়ে আশানভকে কি বলবে তুমি?

—সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলবো। তাকে আমি বলবো তুমি ক্ষমা চেয়েছো।

—কিন্তু তার ক্ষমা আমি চাই না।

—চাও না! পাশিনকভের ভ্রূ হলো কুঞ্চিত···পাশিনকভ বললে—তুমি অপরাধ করোনি, বলতে চাও?

পাশিনকভের পানে তাকালুম। প্রশান্ত মূর্ত্তি···কঠিন রুক্ষ···মুখ মলিন। বুঝলুম, বেদনা পেয়েছে। সে-মূর্ত্তি আমাকে অভিভূত করলে···নিরুত্তরে আমি সোফায় বসে পড়লুম।

পাশিনকভ চলে গেল।

আমার মনের মধ্যে যেন মহাযুদ্ধ চলেছে···লক্ষ-লক্ষ শরের গুচ্ছ যেন বুকখানাকে বিঁধে বিঁধে চূর্ণ করতে লাগলো! সে কি অসহ্য যাতনা!

পাশিনকভ ফিরলো অনেক দেরীতে।

ভয়ে ভয়ে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম—কি খবর?

পাশিনকভ বললে—চুকে গেছে।

—আশানভের ওখানে গিয়েছিলে?

—হুঁ।

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলুম—সে খুব চাল চাললো, নিশ্চয়?

পাশলকভ বললে—তা বলতে পারি না। তবে আমি আরো বেশী-কিছু···মানে, আশা করেছিলুম। কিন্তু সে···মোদ্দা যা ভেবেছিলুম—তা নয়। ওর মন নীচু নয়···উঁচু।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি প্রশ্ন করলুম—আর কারো সঙ্গে দেখা করেছিলে?

পাশিনকভ বললে—হুঁ, জৎনিসকিদের বাড়ী গিয়েছিলুম।

আমার বুকখানা ধ্বক করে উঠলো। পাশিনকভের মুখের দিকে

চাইতে পারলুম না। কোনো মতে মৃদু কণ্ঠে বললুম—সে? মানে, সোফিয়া···

পাশিনকভ আমার কথার অর্থ বুঝলো, বললে—সোফিয়া বুদ্ধিমতী মেয়ে···মনে মায়া-মমতা আছে···প্রথমে কেমন চমকে উঠেছিল! তারপর সব ঠিক হয়ে গেল!···পাঁচ মিনিটের বেশী আমাদের কথা হয়নি।

—তুমি···তুমি তাকে সব কথা বলেছো?···আমার সম্বন্ধে···সব কথা···মানে?

—না···যেটুকু প্রয়োজন, শুধু সেইটুকু বলেছি।

কে যেন আমাকে মুচড়ে ভেঙ্গে দিলে!···নিশ্বাস ফেলে নত মুখে আমি বললুম—ও-বাড়ীতে জীবনে আর মুখ দেখাতে পারবো না।

—কেন? নিশ্চয় তুমি যাবে ওখানে। রোজ না পারো··· হামেশা যাবে! যাওয়া তোমার উচিত। তাহলেই মন পরিষ্কার হবে, সরল হবে।

—তুমি নিশ্চয় আমাকে খুব ঘৃণা করছো ইয়াকভ!

কথাটা বলে নিজেকে সম্বরণ করতে পারলুম না! আমার দুচোখে জল ঠেলে এলো।

পাশিনকভের দুটি চোখে মমতার দৃষ্টি···পাশিনকভ বললে—ঘৃণা! কি পাগলামি করছো তুমি!···আমি কি বুঝছি না, এ আঘাত কি কঠিন হয়ে তোমার মনে বেজেছে! কত যাতনা পাচ্ছ তুমি!

সস্নেহে আমার হাতখানা চেপে ধরলো পাশিনকভ···তার বুকে মাথা রেখে অশ্রুর বন্যায় আমি ফেটে পড়লুম!

তারপর ক'দিন পাশিনকভকে দেখলুম, কেমন মলিন, ম্লান মুখ ···মন-মরা-গোছ! আমি ভাবলুম, হয়তো আমি ওর কথা মেনে

জৎনিসকিদের ওখানে যাচ্ছি না, তাই! ঠিক করলুম, আজই যাবো জৎনিসকিদের ওখানে। এবং গেলুম।

ড্রয়িং-রুমে পা দেবামাত্র আমার মনে যা হলো···ভাষায় তা প্রকাশ করবার সামর্থ্য নেই! এখনো মনে আছে, ঘরে যারা বসে ছিল, তাদের চিনতে পারিনি···যেন ছায়ার আবরণে অস্পষ্ট তাদের মূর্ত্তি! সোফিয়া কেমন কাঠ হয়ে বসে আছে! অনেকক্ষণ সে আমার পানে চোখ তুলে চায়নি···নিমেষের জন্য নয়! তাকে কেমন উদভ্রান্ত বিচলিত মনে হয়েছিল! মিথ্যা বলবো না,···মনে হয়েছিল, আমার উপর তার কঠিন বিরাগ! হয়তো ঘৃণাও!···আমিও নিজেকে তার দিক থেকে যথাসাধ্য নির্লিপ্ত রেখেছিলুম!···

তার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা···অবশ্য সোফিয়ার বিবাহের পূর্ব্বে!

তারপর ঘটনাচক্রে আমাকে চলে আসতে হলো রাশিয়ার অপর প্রান্তে···বহু যোজন দূরে···পীটার্সবার্গের কাছ থেকে সুদীর্ঘ-কালের বিদায় নিয়ে। জৎনিসকি-পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলুম··· এবং সবচেয়ে যা অসহ্য বোধ হয়েছিল, তা আমার প্রাণের বন্ধু ইয়াকভ পাশিনকভের কাছ থেকে বিদায়!···দুজনের মধ্যে ব্যবধানের সে-বেদনা কাঁটার মতো বুকে চিরদিন খচ্‌খচ্‌ করেছে!

২

সাত বছর পরে। এ সাত বছর কি করে' আমার কাটলো, জীবনে কত কি ঘটলো, সে-কথা বলবার প্রয়োজন নেই। চঞ্চল বাতাসের মতো সারা রাশিয়া ঘুরে বেড়াতে হয়েছে আমাকে এ সাত বছর···সরকারী চাকরি নিয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে তখন এসেছি রাশিয়ার আর-এক সুদূর প্রান্তে! মন খুব খারাপ। পরে বুঝলুম, ভাগ্যে ভগবান এখানে এনেছিলেন, না হলে·· যাক্!

বুনো দেশ বা বনকে ভয় করবার কিছু নেই। লোকালয়ের আড়ালে ঘন তরু-পল্লবের বুকেই ফোটে সুন্দর ফুল···বর্ণে-গন্ধে আকুল-করা ফুল!

তখন বসন্ত-কাল। একদিন ছোট একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি ···গাড়ী করে'···সরকারী কাজে। জায়গাটা পূর্ব্ব-রাশিয়ায়। গাড়ীর জানলা দিয়ে দু পাশের বন জলা পথ ঘর-বাড়ী দোকান-পাট দেখতে দেখতে চলেছি। বৈচিত্র্যে নয়ন-মন মুগ্ধ হচ্ছে। হঠাৎ দেখি, একটা দোকানের পাশে ছোট পার্ক···সেই পার্কে দাঁড়িয়ে একজন লোক। মুখ তার খুব পরিচিত মনে হলো। ভালো করে' চেয়ে দেখি···ভুল নয়··· পাশিনকভের ভৃত্য এলিসাই! ভারী আনন্দ হলো। গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়লুম। নেমে এলিসাইয়ের কাছে গেলুম।

ডাকলুম—এলিসাই!

সে চমকে উঠলো। আমি বললুম—এখনো পাশিনকভের কাছে চাকরি করছো?

সে বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বললুম—বটে! তোমার মনিব তাহলে এখানে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি তো তাঁর সঙ্গেই বরাবর আছি।...কিন্তু আপনি? আপনি এখানে!

বললুম—হ্যাঁ। সরকারী কাজে এসেছি। কিন্তু কথা নয়...আমাকে নিয়ে চলো তোমার মনিবের কাছে...এখনি।

সাগ্রহে সে বললে—নিশ্চয়! আসুন। আপনাকে দেখলে তিনি খুব খুশী হবেন। আমরা আছি এই দিকে...একটা সরাইখানায়।

পার্ক পার হয়ে আমরা চললুম। সারা পথ এলিসাইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এক কথা—উঃ, তিনি কি খুশী যে হবেন আপনাকে দেখে!

এলিসাইয়ের বাড়ী কালমুকে! চেহারায় গেঁয়ো বর্ব্বর হলেও মনখানি চমৎকার। সাধারণ ভৃত্যদের মতো বোকা নয়...বেইমান নয়...অতি-চতুরও নয়। পাশিনকভকে কি ভক্তিই করে...কতখানি ভালোবাসে! পাশিনকভের কাছে আজ দশ বছর সে কাজ করছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—পাশিনকভ্ ভালো আছে?

এলিসাইয়ের ভ্রূ হলো কুঞ্চিত। মুখে বিষাদের মলিন ছায়া! এলিসাই বললে—আজ্ঞে, না, দেহ খুব খারাপ। তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন না আপনি। শরীর যা হয়েছে...বেশী দিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না!

এলিসাইয়ের স্বর হলো বিজড়িত। একটা নিশ্বাস ফেলে সে আবার বললে—ওঁর শরীর খুব খারাপ বলেই আমাদের দায়ে পড়ে এখানে থাকতে হয়েছে...না হলে হাওয়া বদলাবার জন্য ওঁকে নিয়ে ওদেশায় যাচ্ছিলুম। পথে এই বিপদ।

জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু এখানে এলে কোথা থেকে?

—সাইবেরিয়া থেকে।

—সাইবেরিয়া!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। সাইবেরিয়াতেই উনি বদলি হয়েছিলেন কি না! সেইখানেই তো এ-চোট্ লাগলো!

—অথম! তার মানে, পাশিনকভ মিলিটারীতে ঢুকেছিল?

—আজ্ঞে, না। মিলিটারী নয়···সিভিল চাকরি।

আশ্চর্য্য!···

তাহলে···

কথায় কথায় আমরা সরাইখানায় এসে পৌঁছুলুম···এলিসাই ছুটলো আমাকে ফেলে খবর দিতে।···আমাদের শেষ-বিদায়ের পর পাশিনকভের সঙ্গে এক-বছর বেশ নিয়মিত চিঠি-লেখালেখি চলেছিল···তারপর চিঠি চলতো কালে-ভদ্রে। তার শেষ চিটি আমি পেয়েছি চার-বছর আগে। জবাব দিয়েছিলুম। সে জবাবের জবাব আর পাইনি। এ-চার বছর তার কোনো খবর পাইনি আমি।

বাড়ীর দোরে ঢুকছি···সামনেই দোতলার সিঁড়ি···সিঁড়ির উপর থেকে এলিসাই চীৎকার করে ডাকলো—আপনি আসুন সোজা এই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। আপনাকে দেখবার জন্য উনি একেবারে···

নড়বোড়ে সিঁড়ি···সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলুম। দোতলায় আমায় নিয়ে এলিসাই ঢুকলো বাঁ-হাতি একটা ঘরে। ঘরে অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করছে···দেখে আমার বুকখানা দশ হাত নেমে গেল! অন্ধকার টুকু চোখে ফিকে হলে কোনো মতে ঠাউরে দেখি, চওড়া একখানা বেঞ্চে বিছানা পাতা—আর সেই বিছানার ফার-কোট গায়ে পড়ে আছে পাশিনকভ··· ···জীর্ণ পাতের মতো শীর্ণ বিবর্ণ মূর্ত্তি। আমাকে দেখে একখানি শীর্ণ হাত সে প্রসারিত করে দিলে···আবেগ-ভরে তার সে হাতখানা ধরে আমি বসলুম তার বিছানায় তার গা ঘেঁষে।

বললুম—কি অসুখ, ইয়াশা ? কত কাল ভুগছো ? এমন অস্থি-সার হয়ে গেছে…

ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিলে—অসুখ এমন কিছু নয়…বড় দুর্ব্বল! কিন্তু তুমি এধারে হঠাৎ ?

পাশিনকভের হাত আমার হাতে—সে-হাত আমি ছাড়িনি। নির্ব্বাক তার পানে চেয়ে রইলুম। পাশিনকভ আমার প্রাণের-অধিক বন্ধু! কিন্তু এ কি সেই পাশিনকভ ? এ তার কঙ্কালখানা! চেনা যায় না, সত্যি… শুধু ঐ চোখের দীপ্তি আর ঠোঁটের হাসিটুকু তার এখনো তেমনি আছে! রোগে তাকে এমন জর্জ্জর করেছে…

আমাকে নীরব দেখে পাশিনকভ বললে—তিন দিন কামানো হয়নি… মাথায় চিরুণী পড়েনি, ব্রাশ পড়েনি…দেখে তাই ভয় পাচ্ছো! না হলে যতখানি ভাবনা হচ্ছে তোমার, তেমন খারাপ অবস্থা আমার নয়।

আমি বললুম—আমাকে সব কথা বলো ইয়াশা। এলিসাই যা বলছিল…তোমার নাকি খুব চোট লেগেছে!

—হুঁ…সে এক কাহিনী! মৃদু হাস্যে পাশিনকভ বললে—চোটই… কিসের চোট…শুনলে তুমি অবাক হবে।

—তার মানে ? চোট লাগলো কি করে' ? কিসের চোট ?

—তীরের ফলা!

শিউরে উঠলুম—তীর ?

মুখে মলিন মৃদু হাসি! পাশিনকভ বললে—হ্যাঁ…তীর…তবে পৌরাণিক যোদ্ধার তীর নয়, পঞ্চশরের শরগুচ্ছের তীরও নয়! কাঠের তৈরী সত্যিকার তীর…তার ডগাটা সড়কির মতো ছুঁচোলো।…এমন তীরের চোট লাগলে ব্যাপার অত্যন্ত বিশ্রী হয়…বিশেষ সে তীর যদি মানুষের লাঙ্‌সে বেঁধে!

সভয়ে প্রশ্ন করলুম,—কিন্তু হঠাৎ তীরের চোট···

—বলছি, শোনো।···তুমি তো জানো, আমার জীবনে অসম্ভব অনেক কিছু ঘটেছে!···আমার পাশপোর্ট পাবার সময় যে সব চিঠি লেখালেখি চলেছিল, সে বেশ প্রহসনের মতো, তোমার মনে আছে নিশ্চয়। তীরের চোট্ যা লাগলো, সে-ও আশ্চর্য্য রকমে। শোনো যদি অবাক হবে···আজকের এ সভ্যযুগেও কোনো ভদ্রলোক এমন তীরের চোট পায়! তাও এ চোট্ এ্যাকসিডেন্টের ফলে নয়···খেলাচ্ছলে নয়··· এ তীরের চোট খেয়েছি যুদ্ধে!

—সত্যি? আমি অবাক হচ্ছি শুনে।

—সবটা শুন্‌লে হয়তো মুখে বাক ফুটবে। তুমি তো জানো, তোমার পীটার্স'বার্গ ছাড়বার পরেই আমি নভ গরোদে বদলি হই। জায়গা মন্দ নয়··কিন্তু ক'দিন পরে সে-জায়গা আমার সহ্য হলো না— যদিও সেখানে মনের মতো একটি মানুষ পেয়েছিলুম!···

পাশিনকভ থামলো। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—কিন্তু সে কথা যাক। দু-বছর পরে ভাগ্য প্রসন্ন হলো···ভালো জায়গায় বদলি হলুম। দূর হলেও ভালো···ইর্কটাস্ক প্রভিন্সে। কিন্তু তা হলে কি হবে? ভাগ্য আগে থেকেই আমার আর বাবার জন্য সাইবেরিযাতে জমি মেপে রেখেছিল!···সাইবেরিয়া চমৎকার জায়গা।···ফুল-ফল অপর্য্যাপ্ত···ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করছে। সকলেই এ কথা বলবে। আমারো খুব ভালো লেগেছিল।···ওখানকার আদি-বাসিন্দাদের শাসনের ভার পড়েছিল আমার উপর।···তারা নিরীহ লোক। কিন্তু আমার যেমন অদৃষ্ট··· তাদের মধ্যে বারো-চৌদ্দজন মাথাওয়ালা লোক সরকারের মাশুল মারার কাজে কেমন মেতে উঠলো। চোরাই-মাল পাচার করা,—সরকারকে ফাঁকি দিয়ে আবগারীর বেসাতি···সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লো।

সরকারের বহু টাকা লোকশান! আমার উপর হুকুম হলো দলকে-দল গ্রেফতার করো। গ্রেফতার করেছিলুম কজনকে মাত্র—একজন ওর মধ্যে কিন্তু কোনো রকমে হাত ফশ্‌কে পালালো। তাকে ধরবার জন্য আমিও নাছোড়বন্দা হলুম, এবং আমাদের সঙ্গে তার রীতিমত লড়াই চললো। একটা জঙ্গলে সে লুকিয়েছিল···খবর পেয়ে ছুটলুম। কোন্ ঝোপে সে ছিল লুকিয়ে···ঝোপ থেকে তীর ছুড়লো। সে তীর এসে লাগলো আমার বুকে···একেবারে লাঙসে। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম। মলুম না—বেঁচে সেরে উঠলুম। এখন সে চোট সেরেছে··· তবে ভয়ানক দুর্ব্বল। তাই গভর্ণমেণ্ট আমাকে ছুটী দেছে আর নগদ টাকাও কিছু দেছে···ওদেশায় হাওয়া বদলে শরীরটাকে মজবুত করে তোলবার জন্য।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে সে ক্লান্তি বোধ করলে···বালিশে ঠেশ্ দিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ—তারপর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। গালে ফুটলো রক্তের আভা! শুয়ে সে চোখ বুজলো।

এলিসাই কাছে ছিল···মৃদু কণ্ঠে আমায় বললে—বেশী কথা কইতে পারেন না। বেশী কথা বললে এমনি ঝিমিয়ে পড়েন।

নিস্তব্ধ ঘর···শুধু পাশিনকভের যাতনা-দীর্ণ নিশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ চোখ খুলে পাশিনকভ বলতে লাগলো—এখানে আজ পনেরো দিন পড়ে আছি।···সর্দ্দি লাগলো···তার দরুণ জ্বর। জেলার সরকারী ডাক্তার আমায় দেখছে। ডাক্তারটী ভালো। তাঁর আসবার সময় হয়েছে। একটু বসো, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।···এখন মনে হচ্ছে, জ্বর হয়ে ভালোই হয়েছে···জ্বরের জন্য ভাগ্যে আটকে আছি···তাই তোমার সঙ্গে দেখা হলো। বিধাতার ইঙ্গিত!

এই পর্য্যন্ত বলে আমার হাতখানা নিজের হাতে বেশ করে চেপে ধরলো—হাত একটু আগে বরফের মতো ঠাণ্ডা দেখেছিলুম, এখন দেখলুম, গরম। বুঝলুম, জ্বর আসছে!

পাশিনকভ বললে—আমার কথা থাক। এখন তোমার কথা বলো···কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা!

তাকে কথা কইতে দেওয়া উচিত হবে না! আমি তখন বলতে লাগলুম আমার কথা। দীর্ঘ সাত বৎসরে যত কথা জমা হয়ে আছে··· যতদূর মনে পড়ে, বলতে লাগলুম। কি অধীর আগ্রহে সে শুনতে লাগলো। তারপর হঠাৎ চাইলো এক-গ্লাস জল। এলিসাইকে ডেকে জল আনালুম।

জল খেয়ে ক্লান্তিভরে সে বিছানায় নেতিয়ে পড়লো···দুচোখ মুদ্রিত··· বালিশ থেকে বার-বার মাথা তোলে আবার বালিশে মাথা রাখে। অস্থির ভাব। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমি বললুম—একটু ঘুমোও ···তোমাকে একটু সুস্থ না দেখে আমি এখান থেকে যাবো না ইয়াশা··· এইখানে তোমার কাছেই থাকবো।···পাশে একখানা খালি ঘর পাবো নিশ্চয়!

পাশিনকভ কথা কইলো। বললে—একে কি ঘর বলে! এ হলো ইঁদুরের গর্ত্ত। তোমার কষ্ট হবে।

আমি বললুম—কোনো কষ্ট হবে না। চাকরির কৃপায় এর চেয়ে ঢের খারাপ জায়গাতেও থেকেছি। কিন্তু না, এখন আর কোনো কথা নয়,—তুমি ঘুমোও···আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, আমি বললুম—না, ফের যদি কথা কও, আমি চলে যাবো।

পাশিনকভ চোখ বুজলো···

একটু পরে মনে হলো, ঘুমিয়েছে। নিঃশব্দে উঠে আমি বাহিরে

এলুম—এলিসাই এলো সঙ্গে। আমার আতঙ্কের সীমা ছিল না। এলিসাইকে বললুম—অবস্থা আমি ভালো বুঝছি না তো এলিসাই··· বাঁচবার আশা···

এলিসাই একটা নিশ্বাস ফেললো—কোনো জবাব দিলে না। তার দুচোখ বাষ্পোচ্ছ্বাসে ভরে' এলো।

গাড়ীটা ছেড়ে দিলুম। মালপত্র নামিয়ে পাশিনকভের ঘরের পাশে একখানা খালি ঘর ছিল···সেই খালি ঘরে রাখলুম···তারপর ঢুকলুম পাশিনকভের ঘরে।

ঘরের মধ্যে শুনলুম জুতোর শব্দ। চেয়ে দেখি, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন···দরজায়···দীর্ঘাকার এক ভদ্রলোক। যেমন মোটা তেমনি দীর্ঘ দেহ। মুখে মেচেতা পড়েছে···চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে।···লোকটিকে দেখলে মনে হয়, কোনোমতে যন্ত্রের মতো জীবনটাকে চালিয়ে চলেছেন! চোখ দেখলে মনে হয় কোনোমতে যেন জেগে আছেন···তন্দ্রা-বিভোর দুই চোখ!···দুনিয়ার কোনো দিকে দৃষ্টি না রেখে রুটিন মেনে যারা কাজ করে' চলে, তাদের যেমন দেখবামাত্র চেনা যায়—এঁকে দেখে তেমনি তাদেরই একজন বলে মনে হলো।

বললুম—ক্ষমা করবেন···আপনি বোধ হয় এ জেলার সরকারী ডাক্তার?

মোটা ভদ্রলোক আমার পানে তাকালেন। চকিতে আমার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে নিলেন···তারপর বললেন—হুঁ।

—ওঁকে দেখলেন তো···দয়া করে' যদি আমার ঘরে একবার আসেন! ইয়াকভ ঘুমোচ্ছে, বোধ হয়?···আমি ওঁর বাল্য-বন্ধু···ওঁর সম্বন্ধে সব কথা আমি জানতে চাই···ওঁর জন্য আমি খুব বেশী চিন্তিত।

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বেশ···চলুন।

ডাক্তারকে নিয়ে আমার ঘরে এলুম। এসে ডাক্তার একটা চেয়ারে বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার খুব সিরিয়স? মানে, হোপলেশ কেস্?···আপনার যা মনে হয়, অসঙ্কোচে বলবেন।

একটা নিশ্বাস ফেলে গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্তার বললেন—হুঁ···

—খুব বেশী সিরিয়স?

—হ্যাঁ। খুব সিরিয়স।

—বাঁচবার আশা?

—দিতে পাচ্ছি না।

লোকটার উপর ভয়ানক রাগ হলো। হতভাগা···এমন নিষ্ঠুরের মতো কথা কয়!

মনের সে-ভাব চেপে আমি বললুম—কিন্তু প্রাণ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ এতখানি হতাশ হলে চলবে না। কোনো বড় ডাক্তরের নাম করুন···আমি তাঁকে আনাবো—কনসালটেশনের জন্য! এত-বড় একটা প্রাণ···বিনা-যত্নে নষ্ট হতে পারে না।···বড় ডাক্তার মিলবে এখানে?

—কনসালটেশনের জন্য? হ্যাঁ···তা আইভান এফ্রেনচ্ আছেন। তাঁকে ডাকা যেতে পারে।

—ইনি···

ডাক্তার বললেন—এ জেলার গির্জ্জার ডাক্তার। বেশ বিচক্ষণ।

আমি বললুম—সহর থেকে আরো ভালো ডাক্তার আনা যায় না? আপনি কি বলেন? ভালো ডাক্তার সহরে আছেন নিশ্চয়?

ডাক্তার কি ভাবলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—আনাতে পারেন।

—তাহলে সবচেয়ে যিনি ভালো···আপনার মতে?

—আমার মতে ?···ছিলেন বটে খুব ভালো ডাক্তার কোলরাবাস··· অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন···তবে ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। কারণ, যত বড় ডাক্তারই আনুন···ওঁকে কেউ রক্ষা করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।

আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাবে! রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলুম—এমন অবস্থা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর দেহে আর কিছু নেই···যার জোরে বাঁচবেন!

—আসল রোগটা কি, বলতে পারেন ?

—একটা তীরের চোট লেগেছিল···তার জন্য লাঙসে বেশ জখম··· সেই জখমী লাঙসের উপর সর্দ্দি-কাশী। লাঙস্···মানে,···দুদিকটাই খুব খারাপ। ডবল-নিউমোনিয়া। দেহে এমন শক্তি মজুত নেই, যা থেকে···অর্থাৎ···

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। ডাক্তার বললেন—একবার হোমিওপ্যাথি করে দেখলে কি হয় ?

—হোমিওপ্যাথি! কিন্তু আপনি তো এ্যালোপ্যাথ!

—তাতে কি!···আপনি ভাবচেন, আমি হোমিওপ্যাথি বুঝি না! হোমিওপ্যাথিতেও আমার খানিকটা জ্ঞান আছে। এই যে এখানকার ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার···কোনোকালে হোমিওপ্যাথি পড়েনি··ডাক্তার নয় সে মোটে!···তবু হোমিওপ্যাথি করে গরীব-দুঃখীদের সারাচ্ছে তো···গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তার বেশ পসার।

ক্ষণকাল চিন্তা করে আমি বললুম—না, না, আপনি এ্যালোপ্যাথি-চিকিৎসা করুন।

—বেশ।

ডাক্তার যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আমি বললুম—আপনি আজ ওঁকে দেখেছেন ?

—না ! উনি ঘুমোচ্ছেন।

—আসুন, ভালো করে একবার দেখুন। আমি জানতে চাই এখনকার অবস্থা।

ডাক্তার আবার ঢুকলো পাশিনকভের ঘরে। আমি সঙ্গে গেলুম না। যে-কথা শুনলুম…পাশিনকভের সাম্‌নে দাঁড়াবার কথা মনে করে কেমন শিউরে উঠছিলুম !…বেরিয়ে এলুম…পথে। দেখি, আমার গাড়ীখানা চলে যায়নি ! গাড়োয়ানকে বলে-কয়ে বখশিস কোবলে পাঠালুম কাছাকাছি বড় সহরে…ভালো দেখে ডাক্তার নিয়ে আসবার জন্য। গাড়োয়ানটা চালাক…বললে, আনতে পারবে। গাড়ী নিয়ে সে চলে গেল।

আমি উঠলুম দোতলায়। ডাক্তার বেরিয়ে আসছিল পাশিনকভের ঘর থেকে।

মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম—দেখলেন ?

—হুঁ ! এখনো তেমন উদ্বেগের কারণ দেখছি না। একটা মিকশ্চার লিখে দিলুম।

আমি বললুম—আমি সহরে লোক পাঠিয়েছি বড় ডাক্তার আনবার জন্য। আপনাকে তুচ্ছ বা তাচ্ছল্য করা নয়…তবে কিনা একটা মাথার জায়গায় দু-মাথা এক করে' যদি আপনারা…

—নিশ্চয়…নিশ্চয় ! এ তো খুব ভালো যুক্তি।

ডাক্তার নেমে গেলেন,…আমি ঢুকলুম পাশিনকভের ঘরে।

পাশিনকভ জেগেছিল…আমায় দেখে বললে—এখানকার ধন্বন্তরিকে দেখেছো ?

বললুম—হুঁ···দেখলুম।

পাশিনকভ বললে—ডাক্তারী-বিদ্যায কতখানি দখল আছে, বলতে পারি না, তবে ওঁর একটি গুণ আছে···মানে, কিছুতেই ভড়কায় না!···ডাক্তারের পক্ষে এটা মস্ত গুণ···রোগী এতে খানিকটা বল পায়!

কথাটা শেষ করে' পাশিনকভ হাসলো—মলিন মৃদু হাসি। আমি এ-কথার জবাবে কিছু বললুম না।

সন্ধ্যাব সময় পাশিনকভ অনেকটা ভালো রইলো। এটুকু আমরা প্রত্যাশা করিনি।···এলিসাইকে ডাকলো, বললে—চায়ের সরঞ্জাম আনো ···বন্ধুকে ভালো করে চা খাওয়াবো।

নিজের হাতে চা তৈরী করে' আমায দিলে পাশিনকভ, নিজেও ছোট-পেয়ালার এক পেয়ালা চা ঢেলে খেলে। চা-পানের পর তার মন শুধু হাল্‌কা নয়, খুশী হয়েছে দেখলুম।···কথা তার থামে না, চুপ করাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলুম···সে শুনবে না। তখন আমি বললুম —বলো যদি তো তোমাকে কোনো বই পড়ে শোনাই।

সে বললে—যেমন উইণ্টারফেলারের ওখানে ছেলেবেলায় পড়া হতো, মনে আছে তোমার?

আমি বললুম—নিশ্চয়···ছেলেবেলাকার অনেক কথা ভুললেও সে কথা ভোলবার নয়।

পাশিনকভ বললে—বেশ, পড়ো···তোমার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে!··· কিন্তু কি বই পড়বে বলো তো? জানলার মাথায় সেল্‌ফে আমার ঐ কতকগুলো বই রয়েছে···

জানলার ধারে গেলুম। এবং প্রথমে যে-বইখানায় হাত পড়লো, সেইটে নিলুম।

পাশিনকভ বললে—ওটা কি বই ?

দেখে আমি বললুম—লার্মনৃতভ।

—লার্মনৃতভ! ও...চমৎকার লেখেন!...অবশ্য পুশকিনের সঙ্গে তুলনা চলে না...তবু...হঁ্যা ..ভালো। মনে আছে...

বলে' আবৃত্তির ভঙ্গীতে সুরু করলে—

প্রশান্ত আকাশ তলে ঘিরিযা আমারে
কালো মেঘ ঘন হয়ে জমিছে প্রসারে...

আর সেইটে,—"তোমার মূরতি মধুর আমার স্মরণে—আজি শেষবার মনে জাগে হেম-বরণে।"...আঃ, চমৎকার! লার্মনৃতভের লেখা আমার খুব ভালো লাগে। বইয়ের যে-পাতা খুশী খুলে যে-লাইনটা খুশী পড়ো... পড়ে মুগ্ধ হবে!

বই খুললুম। সে-পাতায ছাপা 'শেষ সাধ' কবিতা।...দু-চার ছত্র পড়ে পাতা উল্টোতে যাচ্ছিলুম...পাশিনকভ আমার পানে চেয়েছিল একাগ্র দৃষ্টিতে, বললে—না, না, উল্টো না...ঐ পাতায যেটা আছে, পড়ো।

আমি বললুম—এ পাতায আছে 'শেষ সাধ'।

—হঁ্যা, হঁ্যা, ঐটেই পড়ো...

আমি পড়তে লাগলুম—

জীবনের দিন ক্ষীণ হয়ে আসে বন্ধু'
যে ক'দিন বাঁচি, রহিব তোমার সাথে,—
আমি চলে গেলে যেথা খুশী চলে যে'য়া—
আছি যতখণ, হাতখানি রাখো হাতে,
নয়নে রুধিয়া রাখো নয়নের জল—
আমার ভাগ্য—সত্য করিয়া কহি—

যা নেছে, যা দেছে,—বিচারে বলো কি ফল ?
জানাতে চাহিনা কতখানি আমি দহি !
যদি কেহ কহে, কি তব বেদনা কহ ?
বলি তারে বুকে বিঁধেছে তীক্ষ্ণ তীর,
নীরবে সয়েছি তারি ব্যথা দুঃসহ !
কারো চোখে আমি বহাইনি ব্যথা-নীর।
আমি চলে গেলে, ব্যথা তায় বাজে কার—
দুনিয়ার কেহ নাহি কো এমন জন !
আমার জীবনে নামিলে অন্ধকার—
ছায়ার পরশে দুলিবে না কারো মন।
পড়শী কিশোরী—মনে পড়ে শুধু তারে—
সন্ধ্যা মলিন বিদায়-ব্যথার ভরি'—
খোঁজেনি, বোঝেনি, দেখা হলে বোলো তারে
বিন্দু অশ্রু ফেলে যেন মোরে স্মরি !
একটি বিন্দু দিলে নয়নের বারি
এতটুকু ক্ষতি হবে না বন্ধু, তারি।

কবিতা পড়া শেষ হলে পাশিনকভ বললে—চমৎকার।

তার কণ্ঠ গাঢ়··· চোখ বাষ্পোচ্ছ্বাসে সজল ! নিশ্বাস ফেলে পাশিনকভ বললে—চমৎকার! কিন্তু আশ্চর্য্য, পাতা ওলটাবামাত্র এই কবিতাটিই তুমি···আশ্চর্য্য !

আর একটি কবিতা পড়বার উদ্যোগ করছি···পাশিনকভ হাত নেড়ে নিষেধ জানালো।···সে চেয়ে রইলো খোলা জানলা দিয়ে বাহিরে যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছিল, সেই আকাশের পানে। নিশ্বাস ফেলে মৃদু-কণ্ঠে বললে—আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

দুই বন্ধ করে তার পানে আমি চেয়ে রইলুম।

পাশিনকভ আপন-মনে বলতে লাগলো—মেয়েটি পাড়ায় থাকতো··· হুঁ···ভালো কথা, তোমার মনে আছে নিশ্চয় জৎনিসকিদের ছোট মেয়ে সোফিয়াকে ?

আমার মুখে যেন চাবুক পড়লো ! বললুম—হুঁ।

—তার বিয়ে হয়ে গেছে বোধ হয় ?

—নিশ্চয়···সেই আশানভের সঙ্গে। সে তো বহুকালের কথা··· তোমাকে আমি বিবাহের কথা লিখেছিলুম তা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ···ঠিক ! তুমি লিখেছিলে বটে।···বাপ তাকে ক্ষমা করেছিলেন ?

—তাকে করেছিলেন···কিন্তু আশানভকে গ্রহণ করেননি··· আশানভের মুখও বাপ দর্শন করেননি।

—ভয়ানক জেদী ভদ্রলোক!···বিয়ে করে ওরা সুখী হয়েছে নিশ্চয় ?

বললুম—সুখী, কি, অসুখী, তা আমি জানি না। মনে হয়, সুখী হয়েছে···ভালোবাসার বিবাহ তো।···তারা কোন্ একটা গ্রামে থাকে··· শুনেছি। সে গ্রামে আমাকে দু-চারবার যেতে হয়েছে এই চাকরির ব্যাপারে···তবে তাদের সঙ্গে দেখা আর হয়নি।

—হুঁ···ছেলেপিলে হয়েছে ?

—হয়তো হয়েছে···ঠিক জানি না। কিন্তু পাশিনকভ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো···ঠিক জবাব দেবে ?···

পাশিনকভ আমার পানে তাকালো।

আমি বললুম—আচ্ছা, সত্য করে আজ আমাকে বলবে···সেদিন আমার কথায় জবাব দাওনি···আজ বলবে, সোফিয়াকে আমি কতখানি ভালোবাসি, সে কথা সোফিযাকে তুমি বলেছিলে সেদিন ?

—আমি তাকে সত্য ক' র সবটুকু বলেছিলুম। তা.ক কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। তার সঙ্গে কাপট্য…সে চিন্তায় আমার বুক কেঁপে উঠতো…তার সঙ্গে কাপট্য করার নাম ··অধর্ম্ম।

পাশিনকভ কিছুক্ষণ চুপ্ করে রইলো…তার পর বললে—হ্যাঁ বলো, তো—তোমার সে ভালোবাসা ভুলতে পেরেছো? না, এখনো তার জন্য…

আমি বললুম—মিথ্যা বলবো না—অনেকদিন পর্য্যন্ত সে-আঘাতের বেদনায় বুক টন্‌টন্ করেছে, তার পর কাজের মধ্যে সে-চিন্তা ডুবিয়ে দিযেছি। মিথ্যা নিশ্বাস ফেলে লাভ?

পাশিনকভ আমার পানে চেয়ে আছে একাগ্র দৃষ্টিতে। একটা উত্তপ্ত নিশ্বাস যেন রোধ করলে! তার পর বললে…কম্পিত কণ্ঠে—তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ এইখানে। আমি তাকে আজো ভুলতে পারিনি।

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম! অবাক! প্রশ্ন করলুম,—তার মানে? সোফিয়াকে তুমি ভালো বেসেছিলে?

—হুঁ। ধীর কণ্ঠে পাশিনকভ বললে—সে কি ভালোবাসা, জানেন শুধু আমার অন্তর্যামী।…সে-কথা কাকেও বলিনি…বলবার ইচ্ছাও কোনোদিন মনে জাগেনি। কিন্তু…ঐ কবিতায় যা পড়লে… বলো তো…"জীবনের দিন ক্ষীণ হয়ে আসে বন্ধু"…তাতে কার কি ক্ষতি?

পাশিনকভের এই আত্মপ্রকাশ…আমায় যেন বিহ্বল করে তুললো। এ'ও সম্ভব? কিন্তু এ-সম্ভাবনার কথা কোনোদিন আমার মনে জাগেনি ··কিছু লক্ষ্য করিনি আমি!

পাশিনকভ বলতে লাগলো—যেন নিজেকে উদ্দেশ করেই আপন-মনে—তাকে ভালোবাসতুম·· আশানভকে সে ভালোবাসে জেনেও আমার মনকে নিবৃত্ত করতে পারিনি।…সোফিয়া যদি তোমাকে

ভালোবাসতো, আমি খুব খুশী হতুম···সত্যি। কিন্তু আশানভ···ও মানুষটির মধ্যে সোফিয়া কি যে দেখেছে! একে বলে, ভবিতব্য · মনকে কি করে সে ফেরাবে? যে-মন খাঁটী, তার নিষ্ঠাও অসাধারণ···ভেঙ্গে গেলেও সে-মন মচ্‌কায় না।

সব কথা আমার মনে পড়লো,—আমার কাছে আশানভের সেই রুদ্র মূর্ত্তিতে আবির্ভাব···পাশিনকভের মধ্যস্থতা···আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না।

আমি বললুম—আমার কাছে সব কথা শুনে তুমি নিজে যেচে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করছিলে···আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলুম কিন্তু।

পাশিনকভ বললে—হুঁ। ··সোফিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া···সে-কথা আমি জীবনে ভুলবো না। ··সেদিন সোফিয়ার সঙ্গে কথা কয়ে আমি যা বুঝলুম···তার অর্থ, উৎসর্গ!···ত্যাগ!···তবু আজো তাকে ভুলতে পারিনি! আমার মনে সে জেগে আছে অহরহ···স্বপ্নের মতো···আমার মানসী প্রতিমা!···আমার জীবনের আদর্শ!·· জীবনে যার কোনো আদর্শ নেই, তাকে আমি কৃপার যোগ্য মনে করি, বন্ধু।

পাশিনকভের দিকে তাকালুম—তার দু চোখে অসাধারণ দীপ্তি!

পাশিনকভ বলতে লাগলো—তাকে আমি ভালো বেসেছিলুম···সে ভালোবাসায় লজ্জার কিছু ছিল না—পাওযার প্রার্থনা ছিল না···অকলুষ ভালোবাসা যাকে বলে, সেই ভালোবাসা! সে যেদিন আশানভের সঙ্গে দূরে চলে গেল···আমার বুক যেন···কি অসহ্য যাতনাই পেযেছিলুম! ···তার পর থেকে আমার পৃথিবী শূন্য হযে গেছে! কাকেও আর মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনি। এই পর্য্যন্ত বলে পাশিনকভ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে লুটিয়ে পড়লো···বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

আমি তাকে ধরলুম···তাকে কত বোঝালুম···

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে মাথার চুলগুলোকে কপাল থেকে সরাতে সরাতে নিশ্বাস ফেলে বললে—কিছু নয় হঠাৎ কেমন ব্যথা বোধ হলো! নিজের জন্য দুঃখ হয় ·এখনো এমন দুর্বলতা। যাক, হয়তো ঐ কবিতা শুনে! তুমি অন্য কবিতা পড়ো, শুনি।

বইখানা নিয়ে তাড়াতাড়ি অনেকগুলো পাতা উলটোলুম পাতা উল্টে যে-কবিতায় চোখ পড়লো—আশ্চর্য, সেটাও পাশিনকভের মনের প্রতিধ্বনি! কবিতাটির নাম 'দান'।

পড়তে লাগলুম। পড়া শেষ হলে পাশিনকভ বললে—ছন্দের ধ্বনি চমৎকার, কটা লাইন বেশ ভালো। জানো, আমি নিজে এককালে কবিতা লিখতুম। একটা কবিতা খানিক মনের মতো হয়েছিল। সেটার নাম "জীবনের পেয়ালা"। লেখা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা··· মানে, আমাদের মতো মানুষ কবিতা পড়ে তার মর্ম উপলব্ধি করবো—নিজেরা কবিতা লিখবো না।·কিন্তু বড় ক্লান্ত বোধ করছি। একটু ঘুমোই···কি বলো?·ঘুমে কতখানি আরাম পাই, বলে বুঝোতে পারি না। আমাদের এ জীবনটা কি? স্বপ্ন!···কাজেই স্বপ্ন দেখে যদি জীবন কাটাতে পারি, তার চেয়ে সুখের আর কি আছে।

আমি বললুম—কাব্য?

—কাব্যও স্বপ্ন।···কাব্য হলো স্বর্গের স্বপ্ন। নয়?

পাশিনকভ চোখ বুজলো।

তার বিছানার পাশে খানিকক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। এত শীঘ্র ঘুমোতে পারবে বলে মনে হলো না।—মনের উপর এত বড় ব্যথার ক্রিয়া···স্মৃতির শরগুচ্ছ। কিন্তু একটু পরেই ওর নিশ্বাস হলো সরল··· দীর্ঘ।···বুঝলুম, ঘুমিয়েছে।

পা টিপে নিঃশব্দে বেরিয়ে আমি এলুম আমার ঘরে! সোফায় দেহ লুটিয়ে দিলুম। মাথায় নানা চিন্তা···পাশিনকভ যে-সব কথা বললে, সেই সব কথাকে কেন্দ্র করে' চিন্তার তরঙ্গ বয়ে চললো। অতীতের কত কথা মনে পড়ছিল···

এমনি নানা চিন্তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লুম।

কার স্পর্শে যেন ঘুম ভাঙ্গলো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে এলিসাই।

এলিসাই বললে—শীগগির এ-ঘরে আসুন।

উৎকণ্ঠা-ভরে প্রশ্ন করলুম—কি হয়েছে?

—উনি ভুল বকছেন।

—ভুল বকছে!···আগে এমন হয়েছে কখনো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। কাল রাত্রেও এমনি ভুল বকেছিলেন। এখন যেন ·

তখনি ছুটলুম পাশিনকভের ঘরে।·· দেখি, বিছানায় শুয়ে নেই পাশিনকভ···উঠে বসেছে। মাথা ঝুঁকে নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। ···ধীরে ধীরে হাত নাড়ছে বকছে হাসছে নিজের মনে। অত্যন্ত চাপা মৃদু কণ্ঠ মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস। · চোখের দৃষ্টি চঞ্চল—পলকের জন্ম স্থির নয়। ঘরে বাতি জ্বলছিল, তার মিটমিটে আলো · ঘরের অন্ধকারে আরো ভয়ানক মনে হলো!

কাছে গেলুম···নাম ধরে ডাকলুম। পাশিনকভ কোনো জবাব দিলে না। বিড়্ বিড়্ করে কি সে বকছিল···শোনবার চেষ্টা করলুম। কতকগুলো কথা বুঝলুম। বলছিল,···বন বন···ক্ষেত ফুল···ফল···নদী পাহাড়···কথাগুলো অর্থহীন প্রলাপ নয় একেবারে!

পাশিনকভ বলছিল,—উঁচু-উঁচু সব গাছ ··আকাশ ছুঁয়েচে যেন।··· গাছের মাথায় বরফ পড়েছে ·কুচো বরফ · রূপোর অসংখ্য কুচি। তার পর একটু চুপ করে থাকে, আবার বলে,—একটা খরগোশ ছুটে গেল ··ঐ ঐ ··ওদিকে একটা বেজি।·· না···না · বাবা বাবা কোথায় চলেছো কাগজের তাড়া হাতে। ওগুলো আমার কাগজ ·· কাগজগুলো দাও আমাকে ঐ যে ঐগুলো। বাঃ, কি চমৎকার ফুল। টক্‌টকে গোলাপী-রঙের ফুল ও তো সোনিচকা! ঘণ্টা বাজচে না? হুঁ। ঐ যে ইস্ বরফগুলো গুঁড়িয়ে চুর হয়ে যাচ্ছে! না, না, না, ওটা ফড়িং ঐ যে ঝোপে লাফাচ্ছে। একটা পাখী ডাকছে। ঐ একটা নক্ষত্র খশে' পড়লো আকাশ থেকে ওঃ, খশে' ওটা শোঁ-শোঁ করে' চলেছে! না, না, নক্ষত্র নয় ·তীর ধাবালো তীর। ওঃ উঃ, উঃ, আমার বুকে এসে লাগলো · বুকখানা বিঁধে একেবারে তোলো তোলো তীরটা, তুলে দাও ·বুক জ্বলে যাচ্ছে! কে ছুড়লো এ তীর? তুমি? সোফিয়া? তুমি তীর ছুড়েচো আমার বুকে তাগ্ করে'

পাশিমকভের মাথা ঝুঁকে নুয়ে পড়লো এখনো বকছে খুব মৃদু স্বর অস্পষ্ট শুধু ঠোঁট দুটী নড়ছে

এলিসাইযের পানে তাকালুম। দু'হাত বুকে অঞ্জলি বদ্ধ · এলিসাই স্থির অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পাশিনকভের পানে ভয়ে সে কাঠ! আমি তার পানে চেয়ে আছি নিস্পন্দ নির্বাক।

হঠাৎ মাথা তুলে পাশিনকভ তাকালো আমার পানে মুখে অতি-মৃদু মলিন হাসি! পাশিনকভ বললে,—তুমি খুব কাজের মানুষ হয়েছো ভাই সব সময় কাজ নিয়ে আছো!

তার [illegible] দু'হাতে পাশিনকভকে জড়িয়ে ধরে' আমি তার পাশে বসলুম।

পাশিনকভ বলতে লাগলো,—এ-জন্মে আমি আর কাজের মানুষ হতে পারলুম না · কোনো দিন নয়। চিরদিন স্বপ্ন নিয়ে কাটালুম! স্বপ্ন আর স্বপ্ন! স্বপ্নের কোনো মানে হয়? সোপাকোভিচের চাষা তার আবার স্বপ্ন! হুঁঃ!

ভোর পর্য্যন্ত এমনি প্রলাপ চললো। কণ্ঠ ক্ষীণ ক্ষীণতর হয়ে শেষে জড়িত অস্পষ্ট হলো। সব-শেষে বালিশে মুখ গুঁজে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়লো।

এলিসাই আর আমি ধরাধরি করে' তাকে বিছানায় শুইয়ে দেবার চেষ্টা করলুম পারলুম না। তার সে যাতনা চোখে দেখা যায় না!

সারা দিন এক ভাবে কাটলো। ডাক্তার এলেন কিন্তু কি-বা তাঁরা করবেন। সহর থেকে বড় ডাক্তার এলেন দেখে শুনে তিনি বললেন —গোরে দেবার জন্য আমায় ডেকেচো? আমরা জীয়ন্ত মানুষের চিকিৎসা করি। মরা-মানুষের চিকিৎসা আমাদের সাধ্যের বাহিরে।

সহরের বড় ডাক্তার চলে গেলেন।

রাত্রে অবস্থা আরো খারাপ! কি সে অস্থিরতা পাশিনকভের! ···কিছুতেই তাকে এতটুকু আরাম দিতে পারলুম না।·· দারুণ ক্লান্তি-ভরে শেষ রাত্রে আমি এলুম আমার ঘরে··

বালিশে মাথা গুঁজে সবে একটু চোখ বুজেছি, এলিসাই এলো ·· ধীর কণ্ঠে আমায় ডাকলো। মাথা তুলে তার পানে তাকালুম। ভয়ে তার মুখ নীল ··তার সর্ব্ব শরীর কাঁপছে! বিজড়িত কণ্ঠে কোনোমতে সে বললে—একবার চলুন···মনে [illegible]।

ছুটলুম [illegible]র ঘরে। নিস্পন্দ পড়ে আছে···ভো[illegible] আলো

ফুটছে তখন ·ঘরের জানলা খোলা ··পাশিনকভ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেই আলোর পানে।··

বিছানায় পড়ে আছে যেন একখানা শীর্ণ কঙ্কাল ··জীবনের চিহ্ন আছে বলে' মনে হয় না! মৃত কণ্ঠে ভাবলুম—পাশিনকভ·

আমার পানে তাকালো ··চিনতে পারলো···অত্যন্ত চাপা গলায় বল্‌লে,—যাচ্ছি ভাই, · তাকে বলো. তার কথাতেই আমার মন ভরে' আছে।

ধমক দিয়ে আমি বললুম,—কি পাগলের মতো বকচো ইয়াশা!· তুমি সেরে উঠবে ··নিশ্চয়।

—না, না মরণ এসেছে ··তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে। এটা নাও · রেখে দিয়ো আমার একটু স্মৃতি।

কথাটা বলে' নিজের বুকের দিকে তাকালো·· তার পর বললে—কি, জানো?·· অতল সাগর·· সে-সাগরে সোনার ঢেউ · সাগরের বুকে সবুজ দ্বীপ, স্ফটিকের মন্দির সার-সার শুধু তাল গাছ ধূপ-ধূনো ··

কথা জড়িয়ে এলো···এ-কথাগুলো বললে খুব থেমে থেমে

আরো আধ ঘণ্টা তারপর সব শেষ।

এলিসাই কেঁদে পাশিনকভের পায়ে লুটিয়ে পড়লো···আমি চোখ বুজলুম!

তার গলায় ছিল কালো রেশমী-সুতোয়-বাঁধা একটা মাদুলি! সেটা খুলে নিয়ে নিজের কাছে রাখলুম!

[illegible] একটা অমূল্য প্রাণ চিরদিনের জন্য মাটির নীচে চাপা পড়লো।···তার [illegible] দিলুম প্রথম মাটি!

৩

তার পর দেড় বছর কেটে গেছে। কাজের জন্ত আমি মস্কোতে ·· বেশ ভালো হোটেলেই আমার আস্তানা।

একদিন কোথায বেরুচ্ছি, হোটেলের হল-ঘরের দেওযালে যে কালো-বোর্ডে সাদা খড়ির অক্ষরে বড় বড় করে' হোটেলের যাত্রীদের নাম লেখা থাকে, সেই বোর্ডটাতে নজর পড়লো। বোর্ডে লেখা একটা নাম যেন চীৎকার করে' আমায় ডাকলো। সে নাম সোফিযা নিকোলেভনা আশানোভা·· হোটেলের ১২ নম্বর কামরায বাস করছে সোফিয়া!

তার স্বামী আশানভোর সম্বন্ধে নানা কাণাঘুষাই কাণে শুনি ইদানীং ভয়ানক মাতাল আর জুয়াড়ী হযে উঠেছে! মদে আর জুযায় পযসা-কড়ির সব প্রায় উড়িযে দেছে। তাছাড়া কদাচারে-অনাচারে আশানভ একেবারে সীমা লঙ্ঘন করে' চলছে!···তবে তার স্ত্রী চমৎকার মানুষ · যেমন নম্র স্বভাব তেমনি শান্ত শিষ্ট অমায়িক। ··সোফিয়ার সুখ্যাতি সকলের মুখে!

কি-খেয়াল হলো · বেরুলুম না। ফিরে এলুম নিজের কামরায়। · যে শিখা বুকের অতল গহনে ধোঁযার আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে-শিখা আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো!···আমার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ···

সোফিয়ার সঙ্গে দেখা করবার বাসনায় মন অস্থির হলো।···তার সঙ্গে শেষ দেখা ··সেই কবে···তার পর কত বছর কেটে গেছে··· জীবনের উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, আলো-অন্ধকার···সোফিয়াকে কোনোদিন ভুলিনি! আর সোফিয়া?···ঘর-সংসারের কাজে [illegible] সব কথা [illegible] মুছে গেছে [illegible]

[illegible] মৃত্যুর পর [illegible]

চাকরি করছে। এলিসাইয়ের হাত দিয়ে আমার নামের একখানা কার্ড পাঠালুম সোফিয়ার ঘরে। বিশেষ করে' বলে দিলুম—তিনি আছেন কিনা…আর থাকলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা…যদি দেখা করেন …তাহলে কখন, এ-সব কথা যেন জেনে আসে!

এলিসাই তখনি ফিরে এলো। এসে বললে—সোফিয়া নিকোলোভেনা কোথাও বেরুবেন না,…ঘরেই থাকবেন…এবং এখনি আমি গেলে আমার সঙ্গে দেখা হবে!…তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না।

তখনি গেলুম সোফিয়ার কামরায। গিয়ে দেখি, সোফিয়া কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে…তার সামনে মোটা একজন ভদ্রলোক। তিনি বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলছিলেন সোফিয়াকে উদ্দেশ করে —আপনি যা বলেন, বেশ,…কিন্তু ওকে নিরীহ বলবেন না…ও হলো নিষ্কর্ম্মা…সমাজে ও-রকম মানুষ শুধু অচল নয়…সমাজকে এরা করে পঙ্গু…সমাজের রীতিমত অনিষ্ট করে এই সব নিষ্কর্ম্মা পুরুষ!

এ-কথা বলে' সোফিয়ার উত্তরের জন্ম অপেক্ষা না করেই বিদায় নিলেন। সোফিয়া তখন আমার দিকে ফিরে তাকালো…স্মিত হাস্যে আমায় বললে—কত বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো আবার!… বসো…

চেয়ারে বসলুম। সোফিয়া বসলো আমার সামনের চেয়ারে। তার পানে অনেক-ক্ষণ আমি চেয়ে রইলুম। একদিন যে ছিল আমার প্রাণের অধিক, আমার সর্ব্বস্ব…যাকে ভালোবেসে…যাকে দেখে, যার সঙ্গে কথা কয়ে আনন্দে অভিভূত হতুম… আবার তাকে কত কাল পরে দেখলুম! আবেগের দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলুম, অতীতের সে-সোফিয়ার সঙ্গে এখনকার এ-সোফিয়ার [illegible] ছিল না! সে [illegible]
[illegible] তেমনি আছে। কিন্তু আনন্দের সে [illegible]

নেই! সারা অঙ্গে কেমন মলিন ছায়া!···কী ভয়ানক পরিবর্ত্তন!·· সোফিয়াও চেয়েছিল আমার পানে·একাগ্র অপলক দৃষ্টি! সে-ও বোধ হয় দেখছিল, অতীতের সে-আমার সঙ্গে এখনকার এ-আমার কতখানি মেলে!

বয়সে খুব বেড়েছে, সোফিয়াকে দেখে তা মনে হলো না।

তাকে শেষ দেখেছি·ন'বছর আগে। সোফিয়ার বয়স তখন ষোল বছর·এখন পঁচিশ বছর বয়স। ন'বছরে দেহের ছাঁদ এতটুকু বদলায়নি··তেমনি নিটোল, পরিপাটী আছে। চোখে-মুখে সেই সুদৃঢ় ভঙ্গী··তবে দৃষ্টি আরো গভীর হয়েছে··নিবিড় হয়েছে। চেহারার ঢৌল হয়েছে অনেকটা তার মায়ের মতো!

সোফিয়াই আগে কথা কইলো, বললে—আমি রীতিমত চমকে উঠেছি তোমাকে দেখে। তুমিও অবাক হয়েছো খুব·নয়? এ জন্মে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, তা আর ভাবিনি··চেহারা তেমন বদলায়নি তোমার··দেখলে চেনা যায়!···হাঁ, ভালো কথা, কোথায় আছো? কি করছো?

বললুম,—চাকরি নিয়ে মার্বেলের মতো গড়িয়ে বেড়াচ্ছি এখান-ওখান করে'··কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারিনি!···তুমি এইখানেই বরাবর আছো···এই সহরে?

—না·দেশেই থাকি সব সময়। এখানে এসেছি এই ক'মাস।

—হুঁ। মা-বাবা···তাঁরা কোথায়? কেমন আছেন?

—মা মারা গেছেন। বাবা আছেন···পীটার্সবার্গে থাকেন। ভাই চাকরি করছে। বার্বারা আছে ভাইয়ের কাছে।

—তোমার স্বামী?

সোফিয়ার [illegible] রক্তাভাস···লক্ষ্য করলুম।···আমার দিক থেকে

দৃষ্টি ফিরিয়ে একটা উষ্ণ নিশ্বাস চেপে সোফিয়া বললে—দক্ষিণ রাশিয়ার মেলায় এখন ঘোড়ার হাট হয়…তিনি সেই মেলায় গেছেন ঘোড়া কিনতে! ঘোড়ার কী বাতিক তাঁর…ঘোড়াই তাঁর প্রাণ… জানো তো! এখন ঘোড়ার ব্যবসা করছেন। প্রকাণ্ড আড়গড়া করেছেন…ঘোড়া কেনাবেচা নিয়ে মেতে আছেন!

এ-কথার মাঝখানে ঘরে এসে ঢুকলো আট বছরের একটি মেয়ে …মাথায় বিনুনী দুলছে…মুখখানি ভারী মিষ্টি! আর চোখ দুটি… মৃগ-নয়না উপমার কথা মনে পড়ে!

মেয়েটি ঘরে ঢুকেছিল বেশ চপল চরণে…আমাকে দেখবামাত্র গতি হলো মন্থর। মেয়ে থমকে দাঁড়ালো…মাথা নামিয়ে আমায় অভিবাদন জানিয়ে সোফিয়ার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো।

মেয়ের গালে আঙুলের ছোট্ট টোকা মেরে আমার পানে চেয়ে সস্মিত কণ্ঠে সোফিয়া বললে—মেয়ে!…আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকবে না…ভারী ন্যাওটো। এখানে আনবো না ঠিক করেছিলুম—তা রইলো না। কেঁদে কেটে অনর্থ বাধালো।…কাজেই নিয়ে আসতে হলো সঙ্গে!

মেয়েটি আমার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে…আমায় যেন বিশ্লেষণ করছে।

সোফিয়া বললে—ভয়ানক দুষ্টু! কোনো-কিছুতে ভয়-ডর নেই! …তবে লেখাপড়া ভালোই করছে…লেখাপড়ায় মনও আছে বেশ।

মায়ের পানে ভৎর্সনা-পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মেয়ে তুললো প্রতিবাদ… বললে—আমার কথা সকলের কাছে কেন তুমি বলবে…এ্যাঁ!

সোফিয়া বললে—ইনি সকলের দলের নন। আমাদের অনেকদিনের বন্ধুত্ব জানো, তোমার দাদু, দিদু, মাসি…সব্বাইকে উনি জানেন… এঁর নাম…

সোফিয়া আমার নাম বলে' পরিচয় করিয়ে দিলে!

পরিচয় পেয়ে মেয়ে চাইলো আমার পানে···প্রসন্ন দৃষ্টি!

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

অচপল নেত্রে আমার পানে চেয়ে মেয়ে বললে—আমার নাম লিডিয়া।

প্রশ্ন করলুম—ওরা তোমাকে বকে?

—কারা?

আমি বললুম—মা···বাবা?

মেয়ে চাইলো মায়ের পানে।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার বাবা তোমাকে বকেন না?

মেয়ে জবাব দিলে না···মায়ের পানে তাকালো।

হেসে সোফিয়া বললে,—মোটে না! ছেলেমেয়েদের খালি আস্কারা দেবেন আর আদর দেবেন···তাঁকে তো ঝক্কি সামলাতে হয় না! তাঁর আদরেই তো এরা এমন হচ্ছে···যেমন বায়না, তেমনি জেদ!···কিন্তু যাক্ ও কথা···তার পর···এখন তোমার কথা বলো। মস্কোয় এসেছো অফিসের কাজে?

—হ্যাঁ।···তুমি···?

সোফিয়া বললে—আমিও এখানে একটু কাজে এসেছি। উনি এখান-ওখান করে বেড়ান, কিছু তো দেখেন না। কাজেই বিষয়-কর্ম্ম আমাকে একটু-আধটু দেখাশোনা করতে হয়!

লিডিয়া ডাকলো,—মা···

সোফিয়া বললে,—চুপ করো। কথার উপর কথা কইতে কতদিন না তোমাকে মানা করেছি!

মেয়ে তখন মায়ের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিশ্-ফিশ্ করে' কি বললে।

শুনে সোফিয়া হাসলো। হেসে মাথা নাড়লো; তার পর আমার পানে চেয়ে বললে—আচ্ছা, তোমার মনে আছে…আমাদের ওখানে হামেশা আসতেন একজন বন্ধু…কবিতা পড়তেন…বেশ ভালো ভালো কথা বলতেন…আহা, তাঁর নামটা মনে পড়ছে না। কি…

বুঝলুম, কার কথা। বললুম—পাশিনকভের কথা বলচো?

—হ্যাঁ…হ্যাঁ…পাশিনকভ!…উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সোফিয়া বললে,—তাঁর সঙ্গে দেখাটেখা হয় তোমার? তিনি এখন কোথায়?

নিশ্বাস ফেলে আমি বললুম—পরলোকে!

সোফিয়া চমকে উঠলো…ছ'চোথ বিস্ফারিত করে' বললে—মারা গেছেন! আহা!

সোফিয়া একটা নিশ্বাস ফেললো।

লিডিয়া চাইলো মায়ের পানে।…বললে—আমি তাঁকে দেখেছি মা?

—না।…তুমি দ্যাখোনি!…তা…আহা, তিনি মারা গেছেন?

আমি বললুম—শুনে কষ্ট হলো?

সোফিয়া জবাব দিলে না, মেয়ের পানে তাকালো—মেয়েকে উদ্দেশ করে বললে—তুমি তোমার নার্শের কাছে যাও, লিডিয়া…

ভ্রূ কুঞ্চিত করে লিডিয়া বললে,—কেন?

—হাঁ।…

মেয়ে চলে গেল। সোফিয়া আমার পানে তাকালো; বললে,—কিন্তু হঠাৎ কি হলো তাঁর? বলবে তাঁর কথা?

আমি বলতে লাগলুম পাশিনকভের কাহিনী। সংক্ষেপে পরিচয় দিলুম তার দরদ-মমতা-ভরা প্রাণের…কতখানি উঁচু ছিল তার মন! বললুম, তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ বিচ্ছেদের কথা…তার পর হঠাৎ তার অন্তিম-ক্ষণে

আবার দুজনে দেখা···কি করে' আমার চোখের সামনে বেচারীর শেষ নিশ্বাসটুকু বাতাসে মিলিয়ে গেল !···বললুম—এ তো শুধু একটা মানুষের মৃত্যু নয়···একটা অসাধারণ জীবনের অবসান ! আর এ-অবসান শুধু আমাদের ঔদাস্যে, অবহেলার আঘাতে।···পৃথিবীর সকলকে সে ভালো-বেসে ছিল···বিচার ছিল না তার···সকলের উপর সমান প্রীতি, সমান ভালোবাসা ! ভালোবাসার কী কাঙাল সে ছিল ··অথচ কারো ভালোবাসা পায় নি জীবনে। মেয়েদের মধ্যে এক-জনও তাকে ভালোবাসলো না··· এইটিই তার জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।···জীবনে কত মানুষই দেখলুম সোফিয়া ··কিন্তু পাশিনকভের মতো আর কাকেও দেখিনি·। ·· মেয়েরা যে-সব পুরুষকে ভালোবাসে···যাদের জন্য পাগল হয়, তাদের একজনও পাশিনকভের পায়ের নখের যোগ্য নয়। তাই ভাবি মেয়েরা কি দেখে ভালোবাসে পুরুষকে !···মন যার নির্ম্মল ··সরল···নিখুঁত ··তার কোনো দাম নেই মেয়েদের কাছে ? যত বাক্যবীর, চালিয়াৎ, দম্ভে ধরাকে যারা সরা দেখে ··মেয়েরা তাদের চায় কি লোভে ·· আমার কাছে এ এক মস্ত হেঁয়ালি ! পাশিনকভের মতো নিখুঁৎ-মনের মানুষকে মেয়েরা চিনলো না,···এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে !

আমার কথাগুলো সোফিয়া নিঃশব্দে শুনলো···আমার পানে অচপল দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ··তার ঠোঁট এতটুকু নড়লো না···কাঁপলো না · শুধু ভ্রূযুগ ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত হচ্ছিল !

আমার কথা শেষ হলে বেশ শান্ত মৃদু কণ্ঠে সোফিয়া বললে—তোমাকে কে বলেছে, কোনো মেয়ে তাঁকে চেনেনি ? ভালোবাসেনি ?

—কেউ বলেনি। আমি নিজে থেকে জানি এ-কথা।

সোফিয়া কি বলতে যাচ্ছিল ··বলতে পারলো না ! মনে হলো,

কথাটা প্রকাশের জন্য অধীর চঞ্চল…কে তাকে রুখে রাখতে চায়… সোফিয়ার মনে এ নিয়ে সংগ্রাম চলেছে !…

অনেকক্ষণ এমনি ভাব …তার পর সোফিয়া বললে—তুমি জানো না… তোমার ভুল। একটি মেয়েকে আমি অন্ততঃ জানি…যে তার প্রাণ-মন দিযে তোমার বন্ধুকে ভালোবেসেছে ! এখনো বাসে। তোমার বন্ধু সে মেয়েটির জীবনে সর্ব্বস্ব হযে আছে …আজো !…তোমার বন্ধু তার এ ভালোবাসার এতটুকু জানতে পারেন নি। মেযেটিও তাঁকে আভাসে জানায় নি…মনে মনে ভালোবেসেছে চিরদিন !…তোমার বন্ধু মারা গেছেন, এ খবর শুনলে মেযেটি কি করবে, ভেবে আমি আকুল হয়ে উঠেছি !…

যেন রূপকথার আশ্চর্য্য কাহিনী শুনলুম! বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম—কিন্তু মেয়েটি কে, জানতে পারি ?

—এখন বলতে বাধা নেই ! সে-মেয়েটি…আমার বোন বার্বারা !

অবাক হয়ে বললুম—বার্বারা !

—হ্যাঁ…বার্বারা।

—বলো কি, সোফিয়া ?

সোফিয়া বললে—আমায় বলতে দাও…তাহলে !…যে-বার্বারাকে তুমি নীরস প্রাণহীন পাথরের মূর্ত্তি বলতে, সেই বার্বারা তোমার বন্ধুকে কি ভালোই না বেসেছে ! …তোমার বন্ধুর পায়ে ব্যথা না লাগে, তার জন্য সে বুক পেতে দিতে পারে তোমার বন্ধুর চলার পথে !…জানো, বার্বারা বিয়ে করেনি…বিয়ে কখনো করবে না…তোমার বন্ধুর স্মৃতিকে সে পূজা করে আজো !…তার এ ভালোবাসার কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না পৃথিবীতে। আজ তুমি শুনলে। এ ভালোবাসা বার্বারার ইষ্টমন্ত্র…কারো কাছে ইঙ্গিতে আভাসে প্রকাশ করেনি !…নিঃশব্দে এ

ভালোবাসার ব্যথাই সইছে···চিরদিন।···নীরবে ব্যথা সহা···আমাদের বংশে···রক্তে মিশে আছে!

কথাটা শুনে সোফিয়ার পানে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ···তার পর বললুম—তোমার কথা শুনলুম···আমিও তোমাকে তার সম্বন্ধে এমন খবর দিতে পারি সোফিয়া···যে খবর শুনলে তুমিও আশ্চর্য্য হবে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সোফিয়া তাকিয়ে রইলো আমার পানে···তার পর দ্বিধাভরে বললে—কি খবর?···

মৃদু হেসে জবাব দিলুম—ভয় নেই···আমার নিজের কথা বলছি না। এ কথার সঙ্গে আমার নিজের কোনো সম্পর্ক নেই!···

এইটুকু বলে' আমি চলে এলুম। এলুম আমার নিজের কামরায়। সেখানে ছিল সেই রেশমী সুতো···পাশিনকভের কাছ থেকে যে সুতো পেয়েছি!···মাদুলিটা পাঠিয়ে দিলুম সোফিয়ার কাছে···সেই সঙ্গে একখানা চিঠি। নিজে গেলুম না। চিঠিতে লিখলুম,—

এই রেশমী সুতোটুকু আমার বন্ধু গলায় পরে থাকতো···মালার মতো···আজীবন··· অন্তিম-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। এতে যে-মাদুলি...সে মাদুলির মধ্যে তোমার একখানি চিঠি আছে। তুচ্ছ চিঠি...তুমি তাকে কবে লিখেছিলে! চিঠিখানি পড়তে পারো। তোমার হাতের এই তুচ্ছ লেখাটুকু ছিল তার গলার হার···সব সময়ে ধারণ করে' থাকতো। মৃত্যুর ঠিক আগে আমার কাছে প্রকাশ করে' বলেছে তার মনের গোপন-কথা···তোমাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছে চিরদিন। বন্ধু আজ বেঁচে নেই···এখন এ-কথা তোমায় জানাতে বাধা নেই যে বন্ধু তোমাকেই মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিল!

এলিসাইযের হাতে চিঠি আর রেশমী-সুতোয় বাঁধা মাদুলিটি পাঠালুম।

একটু পরে এলিসাই ফিরে এলো···সেটা শুদ্ধ···ফেরত নিয়ে।

আমি বললুম—এর মানে ?···কোনো চিঠি ছায়নি ?

—না।

চুপ করে রইলুম···দু মিনিট! তারপর জিজ্ঞাসা করলুম—চিঠি পড়েছিল ?

—হুঁ···পড়লেন বৈ কি। আমার সামনেই পড়লেন।

—আশ্চর্য্য !···

পাশিনকভের শেষ কথাগুলো মনে পড়লো। এলিসাইকে বললুম, —আচ্ছা, তুমি যাও।

এলিসাই গেল না···শুধু একটু হাসলো।

তার পানে চাইলুম। এলিসাই বললে—একটি মেয়েলোক এসেছেন··· আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!

—মেয়েলোক !···কে ?

এলিসাইয়ের মনে ক্ষণেকের দ্বিধা···তারপর বললে,—মনিব আপনাকে কোন কথা বলেন নি ?

—কি কথা ?

—এই মেয়েলোকটির কথা ?

—না !···কে মেয়েলোক ?

দ্বারের দিকে চেয়ে এলিসাই বললে—মনিব যখন নভ-গরোদে ছিলেন, তখন এই মেয়েলোকটির সঙ্গে তাঁর জানাশুনা হয়। সেই মেয়েলোক ···আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। পথে সেদিন এঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল···তখন এঁকে আপনার কথা বলি। সেইদিনই ওঁকে বলেছিলুম আমার সঙ্গে আসতে···বলেছিলুম, আপনার কাছে আমি কাজ করছি এখন।···আজ এখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বললুম—আসতে বলো।···কিন্তু···মেয়েটি দেখতে কেমন ?

এলিসাই বললে—গরীব-ঘরের মেয়ে···কারিগর···জাতে রাশিয়ান।

—কিন্তু ইয়াকভের সঙ্গে···

কথাটা শেষ করতে হলো না। এলিসাই বললে,—আজ্ঞে, মনিব এঁকে খুব ভালোবাসতেন। আর মেয়েটিও··মনিব মারা গেছেন শুনে পাগলের মতো কেঁদে উঠলেন।···মেয়েটি ভালো।

—হুঁ···আচ্ছা, ওঁকে নিয়ে এসো।

মেয়েটিকে এলিসাই নিয়ে এলো। তার পরণে ছিটের সুতি-গাউন, মাথায় কালো একটা রুমাল বাঁধা···ঘোমটার মতো সে-রুমালে মেয়েটির মুখের আধখানা ঢাকা।

আমার পানে চেয়েই মেয়েটি নতমুখী হলো।

তাকে উদ্দেশ করে এলিসাই বললে,—ভয় কি···যা বলতে চান, এঁকে বলুন। কোনো ভয় নেই!

মেয়েটি যেন কাঠের পুতুল! এগিয়ে গিয়ে তার একখানি হাত ধরে সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

—মাশা। আমার পানে চকিত নেত্রপাত করে' মেয়েটি নাম বললে। কোমল কণ্ঠ। বয়স হবে বাইশ-তেইশ বছর। সুন্দরী···নীল দুটি চোখের চাহনিতে অপরূপ মাধুরী···পরিষ্কার···পরিচ্ছন্ন।

প্রশ্ন করলুম,—ইয়াকভের সঙ্গে তোমার জানাশুনা ছিল?

রুমালের প্রান্তটুকু আঙুলে জড়াতে-জড়াতে মাশা বললে,—হুঁ, জানতুম···ভালো করেই জানতুম! তিনিও আমাকে···

তার কথা হলো রুদ্ধ। বসতে বললুম। লজ্জা-সঙ্কোচের কোনো ভূমিকা-অভিনয় না করে' বেশ সহজভাবেই মাশা একখানা চেয়ারে বসলো···এলিসাই বাহিরে গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম—নভ-গরোদেই ইয়াকভের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল ?

রুমালে হাতখানা জড়াতে-জড়াতে নতমুখে মাশা বললে,—হ্যাঁ··· নভ-গরোদেই। তারপর ছোট একটা নিশ্বাস পড়লো। নিশ্বাস ফেলে মাশা আবার বললে,—পথে কাল হঠাৎ এলিসাইযের সঙ্গে দেখা···ওর মুখে শুনলুম, তিনি নেই!···উনি যখন সাইবেরিয়ায় আসেন, বলে এসেছিলেন আমাকে সর্ব্বদা চিঠিপত্র লিখবেন।···তারপর দুখানি মাত্র চিঠি লিখেছিলেন···আর নয়। তাও সে অনেক দিন আগে। ওঁর সঙ্গে আমি সাইবেরিযাতে আসতে চেয়েছিলুম। উনি কিছুতে রাজী হলেন না!

অপলক দৃষ্টিতে মাশার পানে আমি চেয়েছিলুম। ওর কথা শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলুম,—নভ-গরোদে তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন আছেন ?

—আছেন।

—তাঁদের সঙ্গেই থাকো ?

—আমার মা আর দিদির সঙ্গে আমি থাকতুম। দিদির বিয়ে হয়েছে তো···অনেকগুলি ছেলেমেয়ে···সংসারে খরচ খুব···আয়ে কুলোয় না···তাই মা আমাকে ভয়ানক পীড়ন করতো। তখন দিদির বাড়ী ছেড়ে ইয়াকভের ভরসাতেই আমি চলে আসি। ওঁকে দেখলে আমি সব দুঃখ ভুলে যেতুম। ওঁর কাছে যদি থাকতে পাই, এ ছাড়া দুনিয়ায় আমার অন্য কামনা ছিল না। আমার উপর কতখানি তাঁর মমতা ছিল। এলিসাইকে জিজ্ঞাসা করলে আপনি সব জানতে পারবেন!

বাষ্পোচ্ছ্বাসে মাশার কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। একটা নিশ্বাস ফেলে সে আবার বলতে লাগলো—ওঁর সে-চিঠিখানা এখনো আমার কাছে আছে ···আমাকে লিখেছিলেন। সঙ্গে এনেছি।···

বলে' পকেট থেকে মাশা একতাড়া চিঠি বার করলে,—করে আমার সামনে রাখলো, বললে,—আপনি পড়ে দেখতে পারেন।

তাড়া থেকে একখানা চিঠি নিলুম—পাশিনকভের হাতের লেখা।

চিঠি পড়লুম। বড় বড় সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা ভালোবাসা···

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার বাবার নাম বলো তো···

—বাবার নাম পেপ্রোভনা। নাম বলে' মাশা মাথা নামালো।

আমি বললুম—হুঁ···তা বেশ, তুমি কি চাও, বলো? আমার কাছে কোনো রকম সাহায্য? আমি কিন্তু ক'দিনই বা এখানে আছি! সরকারী কাজে এসেছি, সে-কাজ শেষ হলেই চলে যাবো।···তার উপর এখানে আমি এমন কাকেও চিনি না যে তোমার জন্য···

কথা শেষ হলো না; মাশা একটা নিশ্বাস ফেললো; তার পর ডাগর দুটি চোখ মেলে বললে—যে কোনো রকম একটা চাকরি পেলে ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয় আমার। আমি সেলাইয়ের কাজ জানি,—তাছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা···

ভাবলুম।···কিন্তু কোথায় পাবো তেমন চাকরি! তার চেয়ে নগদ কিছু টাকা দিয়ে যেটুকু হয়···

বললুম,—শোনো মাশা, পাশিনকভের কাছে নিশ্চয় শুনেছো, আমাদের দুজনে কতখানি অন্তরঙ্গতা ছিল···তা ধরো, তোমাকে যদি আমি কিছু টাকা এখন দিই?

আমার পানে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে মাশা বললে,—টাকা!

বললুম,—হ্যাঁ।···টাকা পেলে তোমার ছোটখাট অভাবগুলো যদি···

মাশার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। সে বললে,—টাকায় কি হবে? কতক্ষণ বা!···একটা চাকরি···

বললুম,—বেশ, তাহলে একটু সন্ধান নিতে হবে!···আমাকে সময়

দাও···দেখি চেষ্টা করে!···তবে নিশ্চিত আশা দিতে পারি না সে সম্বন্ধে। তাই···মানে, আমার কাছে কোনো সঙ্কোচ করো না মাশা,— আমাকে তোমার অনাত্মীয় ভেবো না···এই কটা টাকা আপাততঃ নাও··· কাছে রাখো। টাকার জোর মস্ত জোর।

কথাটা বলে ক'খানা নোট বার করে' মাশার হাতে গুঁজে দিলুম।

মাশা নতমুখী···নির্বাক···নিস্পন্দ।

বললুম—নাও···আমার কথা শোনো···

মাশা নিলে নোটগুলো···একান্ত অনিচ্ছায়। তার পর নতমুখেই রইলো···তেমনি নির্বাক।

আমি বললুম,—ভবিষ্যতে কোনো-কিছুর দরকার হলে আমাকে জানিয়ো মাশা···এতটুকু সঙ্কোচ করো না···এখান থেকে যাবার সময় যেখানেই যাই, তোমাকে আমার ঠিকানা দিয়ে যাবো।

জড়িত কণ্ঠে মাশা বললে,—আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ···আপনার অসীম দয়া।···তার পর একটু থেমে আবার বললে,—আমার কথা উনি আপনাকে বলেন নি কখনো?

আমি বললুম,—যেদিন মারা যায়, তার আগের দিন মাত্র আমার সঙ্গে দেখা···তাও দৈবাৎ! সব ঠিক মনে পড়ছে না···তবে মনে হচ্ছে, তোমার কথা যেন বলেছিল!

মাশা চুপ করে' রইলো···খানিকক্ষণ,—তার পর মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—তাহলে আমি আসি এখন।

বিদায় নিবে মাশা চলে' গেল।

আমি চুপ করে' বসে রইলুম···মনে চিন্তার জাল! এই মাশা···তার

সঙ্গে প্যাশিনকভের সম্পর্ক···পাশিনকভের লেখা ঐ সব চিঠি! অথচ সোফিয়ার জন্ম অন্তর-ভরা নিগূঢ় ভালোবাসা···বার্বারার নীরব নৈষ্ঠিক প্রেম···

বেচারী···বেচারী! পাশিনকভের সমস্ত জীবনটা বইয়ের খোলা পাতার মতো চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো! ফ্রাউলিন ফ্রেডরিকার উপর কিশোর-বয়সের সেই প্রথম প্রণয়াবেগ···মনে হলো, ভাগ্য তাকে কতই না দিয়েছিল···ভাগ্যের এ-দানে মানুষের মন যে কাণায় কাণায় ভরে থাকে···বুকের কোনো কোণে এতটুকু অভাব-দৈন্ত থাকে না!

পরের দিন সোফিয়ার কাছে গেলুম। পাশের ঘরে অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করবার পর আমার ডাক পড়লো। সোফিয়ার ঘরে এসে দেখি, লিডিয়াকে নিয়ে সে বসে আছে···গম্ভীর মূর্ত্তি। বুঝলুম, কালকের কথার পুনরাবৃত্তিতে সোফিয়ার বিরাগ!

কথাবার্ত্তা হলো···অনেক কথা···সব এখন মনে পড়ছে না!··· তবে মশকো-সহর···সহরে এত লোক, এত জন···এখানকার পথ-ঘাট··· আব-হাওয়া···দেশের হাল-চাল···এমনি কত রকম কথা!

লিডিয়া আমাদের কথার মধ্যে মাঝে-মাঝে কথা কয়···কখনো চুপ করে' চেয়ে থাকে! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চায়। মায়ের পানেও চায় বিজ্ঞের মতো!···চালাক মেয়ে! বুঝেছে, ইচ্ছা করেই মা তাকে আজ পাশে নিয়ে বসেছে···সঙ্গিনী করে'!

বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম··দরজা পর্য্যন্ত সোফিয়া এলো আমার সঙ্গে আমাকে এগিয়ে দিতে!···

দোরে দাঁড়িয়ে সোফিয়া বললে;—কাল তোমার কথার জবাব

দেওয়া হয়নি! কি-জবাব দেবো? আমাদের জীবন শুধু তো আমাদের নিয়েই নয় যে যেমন খুশী তেমনি করে' জীবনকে চালাবো। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে আরো কত জীবন জড়িয়ে আছে · এক-সুতোয় বাঁধা যেন! সেজন্য জীবনে আমাদের কত দায়িত্ব, কত বন্ধন! নৌকোকে যেমন নোঙরে বেঁধে রাখতে হয়; ঝড়-তুফানে বান্‌চাল্ হবে না, নিরাপদ্ রাখবার জন্য···আমাদের জীবনকেও তেমনি কর্ত্তব্য আর সংযমের নোঙরে বেঁধে রাখতে হয়। ক্ষ্যাপার মতো ছুটলে চলবে কেন? সে-ছোটায় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে না হলে আমাদের জীবনে বাঁধা আরো অনেক জীবন নষ্ট হয়ে যাবে! সংসারের কর্ত্তব্য আমাদের জীবনকে নোঙরের মতো বেঁধে রেখেছে! এ-নোঙর ছিঁড়লে···

কথা শেষ হলো না সোফিয়ার নিশ্বাসের উচ্ছ্বাসে।

কোনো জবাব দিলুম না···নিঃশব্দে চলে এলুম কর্ত্তব্য-ধর্ম্মে মূর্ত্তিমতী কিশোরীর কাছে বিদায় নিয়ে!

সারা সন্ধ্যাটা সেদিন ঘরেই রইলুম। সোফিয়ার কথা নিমেষের জন্য মনে জাগেনি···চিন্তা শুধু পাশিনকভকে নিয়ে।

তার কথা ভোলবার নর!···আদর্শবাদীর শেষ প্রতীক!···অশ্রুর আবেগে উচ্ছ্বাসে আমার মন উচ্ছল হয়ে উঠলো·· হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজছিল শুধু করুণ একটি সুর।

সরল আদর্শবাদী···কর্মধারার সঙ্গে নিজের যোগ সাধন করতে পারোনি তুমি···সেজন্য ইহলোক গভীর বেদনাই পেয়ে গেছ শুধু। তোমার প্রেমের মর্ম ইহলোকে কেউ বোঝেনি! দুঃখ পেয়ে গেছ বন্ধু,—পরলোকে তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক!···অনেকে হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে,—পার্থিব পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার

তোমার সামর্থ্য ছিল না!···কিন্তু আমি জানি, তোমার আদর্শের একটা কথা যদি এ-যুগে কেউ নিষ্ঠাভরে মেনে চলতে পারে, তাহলে ধরণীকে সে সমৃদ্ধ করবে!···

শান্তি···শান্তি!

দুই

আদ্রে কলোশভ্

ছোট্ট একখানি সাজানো ঘর। সেই ঘরে আগুনের ধারে বসে ক'জন তরুণ।

সবে শীত পড়েছে···কাল সন্ধ্যা। টেবিলের উপরে সামোভার। সমোভারে জল ফুটছে···তরুণরা বসে গল্প করছে। সে-গল্পের যতি নেই, ছন্দ নেই!···এলোমেলো ভাবে যে-কথা যার মনে আসছে, তাই সে বলছে। কথায়-কথায় আলোচনা এসে দাঁড়ালো মানুষের মনের বিস্ময়কর নানা বৈচিত্র্যে।···কে কি-রকম অদ্ভুত-মনের মানুষ দেখেছে—অর্থাৎ তোমার-আমার মতো মানুষের সঙ্গে যাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ! সকলেই দু-চারজন মানুষের কথা তুললো···তাই নিয়ে আলোচনা, তর্ক···তর্ক থেকে শেষে বিপর্য্যয় কোলাহল!

ঘরের একধারে একটি বেঁটে ভদ্রলোক একখানা চেয়ারে বসে নিঃশব্দে চা পান করছিলেন। চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে' তিনি একটা সিগার ধরালেন। সিগারের ধোঁয়ার সঙ্গে পাশের ঐ তর্ক-কোলাহল···শীতের সন্ধ্যা বেশ জমাট মনে হলো তাঁর। অবশেষে তিনিও আর চুপ করে' থাকতে পারলেন না···চেয়ারখানা টেনে এনে তিনিও

ভিড়লেন তরুণদের দলে এবং তরুণদের উদ্দেশ করে' বক্তার ভঙ্গীতে বললেন,—

ভদ্রমহোদয়গণ, বসে বসে আপনাদের কথা শুনছিলুম। প্রণিধান করছি সজোরে আপনাদের কথায়। অর্থাৎ আপনারা সকলেই নিজের নিজের মতকে বড় বলে' খাড়া করতে চেয়েছেন। আপনাদের তর্ক শুনে মনে হলো, এমন তর্ক আপনারা আজই প্রথম তোলেননি—তর্ক আপনাদের প্রায় হয় এবং সে-তর্কে চিরদিন আপনারা অপরের মতকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করেন!···এ কিন্তু তর্কের দস্তর নয়···পরের মতকে উড়িয়ে দিয়ে নিজের মতকে আঁকড়ে থাকা আর কূপমণ্ডুক হয়ে থাকা—এ-দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই। তর্ক করতে হলে অপরের মতকে সহ্য করতে হবে, বোঝবার চেষ্টা করতে হবে,—তবেই তো তর্ক হবে সঙ্গত!

কথাটা বলে' ভদ্রলোক সিগারের ছাই ঝাড়লেন, ঝেড়ে উত্তরের প্রত্যাশায় তরুণদের পানে চাইলেন।

তরুণদের দলে আমিও ছিলুম।···ভদ্রলোকের কথা শুনে আমরা সকলে তর্ক থামিয়ে চুপ করে' বসে রইলুম···অনেকক্ষণ। তারপর আমাদের দল থেকে কে-একজন বলে' উঠলো,—তর্ক করছিলুম আমরা শুধু সময় কাটাবো বলে···তর্ক করবো বলে' তর্ক করিনি!···কি করে' সময় কাটাই, বলুন? তাস খেলবো? না, চায়ের পর চায়ের পেয়ালা উড়োবো? না, ঘুমোবো? না, বাড়ী গিয়ে চুপচাপ সব বসে থাকবো?···আপনিই বলুন···

ভদ্রলোক বললেন,—হুঁ, তাস-খেলাটা মন্দ নয়। ঘুমোনো যোদ্দা সবচেয়ে সেরা! ঘুমে যেমন আরাম আর শান্তি, এমন আর কিছুতে নয়। বাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকা···তাতে মনের আর কোনো অস্তিত্ব

থাকে না।...মানে, আমি যা বলচি, আপনারা ঠিক বুঝচেন না... বুঝিয়ে বলি তাহলে, শুনুন।...আপনারা সব ঐ আশ্চর্য্য-ধরণের মানুষের কথা তুললেন না? দু-চারজনের কথা যা বললেন, সে তো আপনাদের কাণে-শোনা গল্প! ও-সব মানুষকে নিজেরা কখনো চোখে ছাখেননি! আমি বলি, চোখে এমন অসাধারণ কোনো মানুষকে দেখে থাকেন যদি, সেই মানুষের কথা বলুন।...শোনা কথাকে অকাট্য অভ্রান্ত বলে' মেনে নেওয়া ঠিক হবে না।...

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। একজন বললে,—আমি তা নিজেকেই আশ্চর্য্য মানুষ বলে জানি। আমার চেয়ে আশ্চর্য্য মানুষ কৈ, আজ পর্য্যন্ত তো দেখলুম না!... আমার জীবনের কাহিনী তো তোমরা সকলেই জানো...তবু যদি চাও, সে কাহিনী আমি আগাগোড়া আবার বলতে পারি।

দ্বিতীয় বন্ধু বলে' উঠলো—না ভাই, তোমার কাহিনী ঢের শুনেছি... আর নয়। মাপ করো।

তৃতীয় বন্ধু চাইলেন সে-ভদ্রলোকের পানে, বললেন—না মশাই, এঁর কাহিনী নয়! আপনার যদি কোনো কাহিনী থাকে, বলুন, আমরা শুনি...নতুন কাহিনী শোনা হবে।

সে-কথায় সায় দিয়ে আমরা বললুম—হ্যাঁ। আপনার কাহিনী ভালো লাগে যদি, আগাগোড়া শুনবো। ভালো না লাগে, চলে যাবো, ব্যস্! ভালো না লাগলেও শুনতে হবে, এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই!...কি বলো হে?

তৃতীয় বন্ধু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাইলেন। আমরা বললুম—তা নয় তো কি!...বলুন মশাই, আপনার কাহিনী...

ভদ্রলোক বললেন,—বেশ...

চেয়ারখানা আরো একটু টেনে তিনি আমাদের সঙ্গে মিলে-মিশে বসলেন। আমরাও তাঁকে ঘিরে বসলুম। সকলের দিকে চেয়ে সকলকে একবার ভালো করে' তিনি দেখে নিলেন···পরে সুরু করলেন কাহিনী :

দশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন মস্কোয় থেকে লেখাপড়া করছি। আমার বাবা ছিলেন একখানা গ্রামের জমিদার। ধার্মিক মানুষ বলে' তাঁর খ্যাতি ছিল। অল্প বয়সে আমার মা মারা যান। একজন জার্মাণ প্রোফেশর পেন্সন নিয়ে একটা বোর্ডিং স্কুল খুলেছিলেন— মাসে একশো রুবল্ মাহিনা দিয়ে বাবা আমাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন,—করে' নিশ্চিন্ত মনে তিনি নিজের ধর্মকর্মে মন দিলেন। প্রেফেশরকে বলে' দিলেন, লেখাপড়া যত না শিখুক, ছেলের স্বভাব-চরিত্র যেন ভালো হয়, দেখবেন।

প্রোফেশরটি ছিলেন ভারী শান্ত-স্বভাবের মানুষ। সরল মন। নিজে বেশ সভ্য-ভব্য বলে' আমার ভব্যতা শিক্ষা সম্বন্ধে ভারী সজাগ ছিলেন। তাঁর এই অতিরিক্ত সজাগ-স্বভাবের জন্য তাঁকে আমি শেষে রীতিমত ভয় করে' চলতে লাগলুম।

একদিন সন্ধ্যার সময় বোর্ডিংয়ে ফিরে দেখি, তিন-চারজন সঙ্গী নিয়ে প্রোফেশর বসে আছেন একটা গোল-টেবিলের সামনে আর টেবিলের উপর ধড় বড় কটা খালি বোতল—আর আধা-আধি ভরতি কটা গ্লাস। দেখে আমি হতভম্ব হয়ে সরে' পড়ছিলুম, প্রোফেশর আমায় ডাকলেন,—এসো, এঁদের সঙ্গে আলাপ করো।

গুরুর কথায় বসতে হলো। খাতির করে' আমাকে দিলেন একগ্লাস পাঞ্চ।

পাঞ্চ মুখে দেবামাত্র আমার চোখের সামনে জেগে উঠলো, রঙীন ভবিষ্যৎ···তার কোথাও এতটুকু সংশয়ের কালি নেই!

সেইদিন প্রথম আমি পেলুম স্বাধীনতার স্বাদ! বেশ মনে আছে, সেদিন নানা প্রশ্নে প্রোফেশরের প্রাণটাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলুম! প্রোফেশরের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ভয়ানক সিগার টানতেন। গায়ে তাঁর যেমন সিগারের গন্ধ, তেমনি গন্ধ আচার-কাশুন্দির! একটা দাঁত তাঁর পড়ে গেছে…গেলেও তাঁকে কম-বয়সী বলে মনে হতো। জার্মাণ মেয়েদের যেমন দস্তুর, দেহের কাঠামোখানাকে বেশ আঁট-সাঁট রেখেছেন। এঁর কথা এত করে' বলার কারণ, ইনি এমন গভীরভাবে আমার প্রেমে পড়েছিলেন যে আমার পক্ষে সে-প্রেম সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল।

আমাদের দল চীৎকার তুললো—না, না, প্রেমের কথা নয়…আপনার রোমান্স-এ্যাডভেঞ্চারের গল্প আমরা শুনতে চাই না। ·

—না, না আপনাদের প্রেমের গল্প শোনাচ্ছি না! ভদ্রলোক বললেন বেশ সহজ কণ্ঠে। বললেন,—আমি একজন অতি-সাধারণ নগণ্য মানুষ। জার্মাণ প্রোফেশরের ওখানেও অতি-সাধারণভাবে বাস করতুম · ঢাকা-চাপার মতো। ক্লাশের যে-সব লেকচারে হাজির না থাকলে চলে না, সেগুলোয় চোখ-কাণ বুজে কোনোমতে হাজির থাকতুম। লেকচারের ফাঁকে যেটুকু অবকাশ মিলতো, বাড়ীতে থাকতুম—কোনো কিছুই করতুম না! অল্প দিনের মধ্যে বোর্ডিংয়ের ছেলেদের সঙ্গে আমার ভাবও হলো ঘনিষ্ঠ রকম। বন্ধুদের মধ্যে বোরোভের স্বভাব ছিল ভারী মিষ্টি! বোরোভের বাপ ছিলেন সহরের এক মঠে আচার্য্য… সদ্য পেন্সন হয়েছে। আমার কাছে বোরোভ হামেশা আসতো… সবার চেয়ে আমাকে তার ভালো লাগতো বলে।…তাকে আমার ভালোও লাগতো না·· মন্দও লাগতো না ··সে আসছে আমার কাছে, …বারণ করতে পারি না! গ্রহণ করতুম নিস্পৃহ ভাবে। এক

বুড়ো খুড়ো ছাড়া সারা মস্কো সহরে আত্মীয়-বন্ধু বলতে তার আর কেউ ছিল না! এই খুড়োটি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতেন··· টাকার অভাব, টাকা চাইতে। আমি কোথাও বেরুতুম না ··প্রোফেশরের লেকচারে শুধু হাজির হওয়া···তার পর বাড়ীতে চুপচাপ পড়ে' থাকা! ··মেয়েদের দেখতুম যেন জুজু! বোর্ডিংয়ের বন্ধুদের মা-বাপ আসতেন বোর্ডিংয়ে তাদের দেখতে···আমি তাঁদের ধারেও ঘেঁষতুম না— পাশ কাটিয়ে থাকতুম। বড়লোকের ছেলে বলে বন্ধুদের কাছে আমার খাতির ছিল। বাবা বাড়ীতে থাকতেন না···দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন ··আমাকে চিঠিপত্র যা লিখতেন, সে শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্য-পালন! হাত-খরচের জন্য আমার বেশ মোটা টাকা বরাদ্দ ছিল···তার উপর পারিবারিক শাসন-নিষেধের বালাই নেই···স্বাধীন মানুষ···এজন্য ক'জন স্তাবকও আমার জুটেছিল!

কিন্তু না, নিজের কথা বড্ড বেশী বলছি···তবে এ কথাগুলো না বলে রাখলে,···যার সম্বন্ধে আমার আসল কথা,—সে কথাগুলো আপনারা ঠিক বুঝবেন না—হেঁয়ালির মতো ঠেকবে।

হ্যাঁ, আমার একটা কুকুর ছিল। কুকুরের নাম আমিস্কা। বেশ খানদানী-জাতের কুকুর। কিন্তু হলে কি হবে, ভারী ভীতু,···বন্দুক দেখলে ল্যাজ গুটিয়ে কোথায় পালাবে, তার ঠিক থাকতো না! একে আমি বড় মানুষের ছেলে, হাতে টাকা-পয়সা আছে·· কারো শাসন-নিষেধ নেই··সম্পূর্ণ স্বাধীন, বেপরোয়া···এমন অবস্থায় সাধারণত যেমন হয়, আমারো তাই হয়েছিল,···অর্থাৎ অসাধারণ-রকমের কিছু একটা আমি করবো, এই ছিল আমার কামনা···এবং এই কামনা বুকে নিয়ে আমি কল্পনার রথে চড়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে বিচরণ করতুম! কত রঙীন স্বপ্ন দেখতুম! এবং এই রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে কতকগুলো কবিতাও

লিখে ফেলছিলুম ··গদ্য-কবিতা। কবিতা লেখবার সময় কিন্তু একটা অনুভূতি কাঁটার মতো বুকে খচ্ খচ্ করতো। মনে হতো, আমি ভয়ানক একা ··অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। জীবন্ত মানুষের সঙ্গ কামনা ক'রে' আমার মন হতো আকুল, অধীর!

"জীবন" এই কথাটা বুকে নানা ছন্দে-সুরে প্রতিক্ষণ লীলায়িত হতো! জীবনকে প্রত্যক্ষ করবো উপলব্ধি করবো কেমন করে'—ভেবে আমি চঞ্চল হতুম।···ভালো কথা, অনেকক্ষণ বকছি, একটা সিগারেট দিন তো!

একজন বন্ধু সিগারেট দিলেন। সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক আবার সুরু করলেন—

একদিন সকালে বোরোভ এসে হাজির···সে হাঁফাচ্ছিল। এসেই বারোভ বললে,—শুনেছো···শুনেছো, কলোশভ এসেছে।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম! বললুম,—কলোশভ! কিন্তু কে সে?

—কলোশভকে জানো না! আরে, আঁদ্রে কলোশভ।···এসো, এসো, উঠে পড়ো তার কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো বলে আসছি!··· ছুটীতে এখানে ছিলনা, কোথায় গিয়েছিল···কাল রাত্রে সে ফিরেছে!

—কিন্তু···সে কে? কি-রকম মানুষ?···আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—সে? ··দেখবে'খন, সে একেবারে ভিন্ন গোত্রের জীব···দল-ছাড়া মানুষ। তাকে দেখলে নিমেষে বুঝবে, সব-কিছুতেই কি তার অসাধারণত্ব!

হেসে আমি বললুম—অসাধারণ মানুষ? ··তাহলে কাজ নেই সেখানে গিয়ে।···তুমি একা যাও বোরোভ···বাড়ীতে আমি খাশা আছি!···

এ সব অসাধারণ মানুষের নাড়ী-নক্ষত্র আমি ভালো করেই জানি !···যত সব চালিয়াৎ সর্ব্বজ্ঞ···সব-তাতে মুরুব্বিয়ানা ঢঙ···অর্থাৎ এই হাম্‌বাগ্‌ জীবগুলোকে আমি মোটে বরদাস্ত করতে পারি না।

—আরে, না, না, না, যা ভাবছো, কলোশভ সে-টাইপই নয় মোটে।

বলতে যাচ্ছিলুম আমি যাবো না···তোমার কলোশভকে এখানে নিয়ে এসো···কিন্তু কি জানি, কেন তা বললুম না। উঠলুম; এবং বোরোভের সঙ্গে কলোশভের ওখানে চললুম।

সহরের প্রান্তে বাঁকা-চোরা নোংরা সরু গলি। সেই গলিতে সেকেলে ধরণের একখানা জবড়জং বাঙলা-বাড়ী। বাড়ীর চেহারা দেখলে মন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে! দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনে উঠোন···উঠোনে দেখি, মোটাসোটা একটি মেয়েমানুষ দড়িতে জামা-কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। উঠোনের এক কোণে কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে একগাদা ছেলেমেয়ে চ্যাঁ-ভ্যাঁ করছে।

ধমক দিয়ে তাদের সরিয়ে বোরোভ আমাকে নিয়ে সিঁড়িতে উঠলো। আতঙ্কে শিউরে আমি তার সঙ্গে সিঁড়িতে উঠলুম।

আপনাদের ভারী বিশ্রী লাগছে···না? ··এই নোংরা আবহাওয়া··· এ-যুগের আপনারা রুচিবাগীশ···আবহাওয়া ভালো না পেলে গল্প শুনতে চান্ না।···কিন্তু ধৈর্য্য হারাবেন না···শুনুন···

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন,—গোটা পনেরো সিঁড়ি পার হয়ে দোতলায় এলুম। দোতলায় উঠেই একটা দালান। যেমন অন্ধকার

তেমনি স্যাঁৎসেতে···সেই দালানের খানিকটা পার হয়ে কলোশভের ঘর। বোরোভের সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকলুম।

···আপনারা ভাবচেন, খুব গরীব বেচারী ছাত্রের ঘর! তাইই! ঘরে ঢুকে দেখি, বড় একটা কাঠের সিন্দুকের উপরে বসে তরুণ-বয়সী এক ভদ্রলোক। মুখে পাইপ। বোরোভকে দেখে হেসে একখানা হাত প্রসারিত করে' দিয়ে অভ্যর্থনা হলো। ভদ্রলোকের সম্বন্ধে মনে দস্তুরমতো বিরাগ নিয়েই সেখানে গিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁকে দেখে সে-বিরাগ নিঃশেষে উবে গেল।···রোদ লাগলে মেঘের ছায়া যেমন উবে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে। তাঁকে ভালোই লাগলো। বোরোভের কথা সত্য···মানুষটার মধ্যে কোথায় যেন অসাধারণত্ব আছে!·· রোগা ···দেহ জীর্ণ···মুখে কিন্তু কেমন কমনীয় কান্তি···সুশ্রী···সুপুরুষ! ভদ্রলোকের মুখ···কি করে' আপনাদের বোঝাবো? যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন, তাঁরাও কলমের রেখায় সে-মুখের সঠিক বর্ণনা দিতে পারবেন না! গড়নের কথা খুঁটিয়ে বলা হয়তো সম্ভব নয়···মোদ্দা, সব নিয়ে মোটামুটি আমার মনে হলো, হ্যাঁ অসাধারণত্ব আছে বটে! আমাদের একশো-জনের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলে কলোশভের উপরেই পাঁচজনের নজর পড়বে! কবি বায়রণ বলে গেছেন না, 'মুখের ছন্দ-সুর'—"মিউজিক্ অফ দি ফেস্"—কলোশভের মুখ দেখে বায়রণের সেই কথাটির অর্থ সেদিন হৃদয়ঙ্গম করলুম।···সত্যই তাই। এবং সে-হিসাবে আর-একটি কথা আমি বলবো···সে-কথা তার মুখের সহাস সরস অকুণ্ঠ ভঙ্গিমায় সত্যই তার অসাধারণত্বের আভাস পেয়েছিলুম আমি। তার হাসিটুকুও অপরূপ স্নিগ্ধ মধুর!

মা-বাপের কথা তার মনে পড়ে না। এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কুকুরের মতো পড়ে থাকতো। আত্মীয়টি সরকারী-চাকরি করতেন। ঘুষ

নেওয়া ধরা পড়ায় চাকরি থেকে বরখাস্ত হন! কাজেই দুনিয়ার উপর তাঁর জ্বলন্ত আক্রোশ এবং সে-আক্রোশের যত জ্বালা, তিনি বর্ষণ করতেন অজস্র ভাবে তাঁর আশ্রিতদের উপর। পনেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত কলোশভ সে-জ্বালা সহ্য করে পড়েছিল আত্মীয়ের বাড়ীতে জীর্ণ একটা কোটরে···নোংরা আবর্জ্জনায় গা ঢেলে। তারপর সে আসে মস্কো সহরে। এসে দু-বছর ছিল এক বৃদ্ধ পুরোহিতের কালা স্ত্রীর বাড়ীতে··· তারপর ঢোকে ইউনিভার্সিটিতে। ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেই তার ভাগ্য একটু মোড় ফেরে! অনেক ছাত্রকে পড়ায়, সে-জন্য অর্থও কিছু পায়। কলোশভ ছাত্রদের পড়ায় ইতিহাস, ভূগোল আর রাশিয়ান্ ব্যাকরণ। এগুলোয় তার বেশ একটু জ্ঞান আছে। রাশিয়ান টেক্সটবুক আর সে-সবের অর্থ পুস্তক এত আছে, যে সেগুলোর সাহায্যে যে-কোনো বুদ্ধিজীবি অনায়াসে ছাত্র পড়াতে পারে। তা ছাড়া কলোশভ যে-সব ছাত্র পড়ায় তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী ঘরের ছেলেমেয়ে। কোনোমতে সব বিষয়ে মোটামুটি একটু জ্ঞান আর হিসাব-নিকাশ শেখা—এই তাদের লক্ষ্য। কলোশভ তাদের পড়িয়ে বেশ কৃতী করে' তুলছিল। সে রসিক নয়···কিন্তু এমন কথা কয় যে সে-কথায় মানুষ তার বশ হয়! তার সঙ্গে দু-মিনিট বসে কথা কইলেই তাকে ভালো লাগবে! যাকে বলে, যৌবনের দীপ্তি···সে-দীপ্তি শুধু তার অবয়বেই সীমাবদ্ধ নয়, তার মুখের কথায়, তার চোখের দৃষ্টিতে, তার হাসির উচ্ছ্বাসে সে-দীপ্তি জ্বল্‌জ্বল্ করছে! প্রোফেশররা বলতেন,—এমন বুদ্ধিমান ছেলে দেখা যায় না! আমাদের সান্ধ্য মজলিশে কলোশভের সান্নিধ্য ছিল একান্ত কাম্য। সে থাকলে আসর জমতো পরম-রমণীয় হয়ে! তার সামনে কারো কথায় বা আচরণে এতটুকু অভদ্র বা ইতর ইঙ্গিত ফোটবার উপায় ছিল না!···

আমার কথা শুনে ···আপনারা হাসছেন···ভাবছেন, বাড়াবাড়ি করছি! কিন্তু না। সেই কবিতা পড়েছেন···

অমর কীর্ত্তি,—ইতিহাসে লেখা নাম—
কতটুকু তার মূল্য?
যৌবন-দিন মানুষের এই জীবনে—
কিছু নাই তার তুল্য!

এ-ছত্রগুলি যেন কলোশভকে দেখেই কবি লিখে গেছেন! কি তার মেধা···আর কি অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি! আমি তাকে শুধু ভালোবাসতুম না···শ্রদ্ধা করতুম!···আমার সে-ভালোবাসা···কোনো স্ত্রীলোককেও আমি এমন ভালোবাসিনি।···আজ এ-বয়সে বলতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই, তার সঙ্গে আমার ভালোবাসা···ছিল যেন উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ভালোবাসা! আর কারো সঙ্গে কলোশভ মেলামেশা বা হাসি-গল্প করলে আমার মনে বেশ হিংসা হতো। রাগে আমি জ্বলে উঠতুম!···তার ভালোবাসা একান্ত যেন আমার···পুরোপুরি নিজস্ব—সে-ভালোবাসায় অপরে ভাগ বসাবে, এ-চিন্তা আমার অসহ্য বোধ হতো।

একটা ঘটনার কথা বলি···কলোশভ আমাদের সকলকেই ভালোবাসতো···বোধ হয়, সমান-সমান···তবু মনে হতো, গাব্রিলভের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যেন একটু বেশী-বেশী। গাব্রিলভ খুব চুপচাপ স্বভাবের মানুষ···অথচ মনে হতো, গাব্রিলভের সঙ্গে কলোশভের সম্পর্ক বন্ধন কোনো কারণে যেন অচ্ছেদ্য!···চুপি-চুপি যা-কিছু কথা তার, তা হতো শুধু গাব্রিলভের সঙ্গে।

তার উপর দেখতুম, মাঝে-মাঝে দুজনে নিঃশব্দে মস্কো থেকে উধাও হয়ে গেছে···একসঙ্গে উধাও! কোথায় গেছে···তার বিন্দুবিসর্গ আমরা

টের পেতুম না!···ছু-দিন, তিন-দিন দুজনের আর দেখা নেই। তারপর দুজনেই হঠাৎ একসঙ্গে এসে হাজির! কলোশভকে প্রশ্ন করলে জবাব মিলতো না···সে শুধু হাসতো। আমার তখন কি যে মনে হতো···শুধু তো আমার কৌতূহল-পরিতৃপ্তি নয়···আমার অস্বস্তির সীমা থকেতো না···আমি চাই, গাব্রিলভ নয়, আমার সঙ্গেই শুধু কলোশভের সব কথা, সব পরামর্শ হোক্!···আমি হবো তার প্রাণের বন্ধু···যা-কিছু ওর গোপন কথা, সে-কথা হবে আমার সঙ্গে, আর-কারো সঙ্গে নয়! এর দরুণ গাব্রিলভের উপর আমার মন হিংসায় বিষে এমন বিষিয়ে উঠতো···মনে হতো ও আমার পরম শত্রু···যে কোনো মুহূর্ত্তে কলোশভকে ও আমার মন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে!···কলোশভ কেন অমন ওর সঙ্গে চলে চলে যায়? কলোশভ ওকে নিয়ে কোথায় যায়? কলোশভ কেন আমাকে তা বলে না? কেন কলোশভ আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না? এর কোনো হদিশ খুঁজে পাই না···অথচ সে-বয়সে দর্পভরে এ রহস্য-যবনিকা-ভেদের কি চেষ্টাই না করেছি!···

কলোশভের কোথাও কিন্তু রহস্য-বাষ্পের চিহ্ন দেখতুম না কোনো দিন···চিরদিন সহজ শান্ত ভাব!·· অনেকে যেমন কৃত্রিম-ঔদাস্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য জাহির করে, কলোশভের হাবে-ভাবে ভঙ্গীতে বা কথায়-হাসিতে তেমন কৃত্রিম-ঔদাস্যের বিন্দুও দেখিনি! তার মতো সহজ খোলা মনের মানুষ দেখা যায় না। ভাবোচ্ছ্বাসে তাকে উচ্ছ্বসিত হতেও দেখেছি! সে-উচ্ছ্বাস কখনো যেমন গোপন করতে দেখিনি তাকে, তেমনি স্থাকামি করতেও কখনো দেখিনি! আমাদের মধ্যে অনেককেই তো দেখি, বড় বা বিশেষ-রকম কিছু করবার সঙ্কল্প হলে পাইপ-মুখে কি গম্ভীর-মূর্ত্তি ধরি, যে হ্যাঁ, সকলে দেখুক আমার অসাধারণত্ব!

কলোশভের এমন গাম্ভীর্য্য কখনো লক্ষ্য করিনি !··তাকে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যাবেক্ষণ করতুম, তার প্রত্যেকটি ভঙ্গীর বিশ্লেষণ করে'—কিন্তু কোনোদিন তার এতটুকু ক্ষুদ্রতা আমার চোখে পড়েনি ! সে ছিল আমার হীরো। তাকে পূজা করতে চাইতুম,—কিন্তু সে-পূজা সে এড়িয়ে চলতো· আমার কাছে কখনো কিছু চায় নি···তাকে আমি লেপটে থাকতে চাই ! বুঝলুম, এ তার মনঃপূত নয় মোটে। আমায় ভালোবাসে, তা বলে সে ভালোবাসার জন্য বাধ্য-বাধকতা—তাতে তার বেশ বিরাগ লক্ষ্য করতুম ! একবার নিতান্ত দায়ে পড়ে আমার কাছ থেকে কলোশভ সামান্য কটা টাকা ধার করেছিল···পরের দিনই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে সে-টাকা সে শোধ দিয়ে যায়। সারা শীতটা তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অটুট। গাব্রিলভের সঙ্গে নিজের তুলনা করতুম। ভেবে পেতুম না, আমার চেয়ে কিসে সে ভালো··কোথায় তার বৈশিষ্ট্য, যার জন্য কলোশভ তাকে এতখানি অন্তরঙ্গ করেছে !

তার পর হঠাৎ একদিন দুনিয়ার চেহারাখানা গেল বদ্‌লে ! এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি··গাব্রিলভের কি যে কঠিন ব্যাধি হলো···বেচারী··· চিকিৎসায় বাঁচলো না। কলোশভের বুকে মাথা রেখে ইহলোকের সঙ্গে সব বন্ধন ছিন্ন করে' সে চলে গেল।···অসুখের প্রথম দিন থেকে অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কলোশভ তার ঘর থেকে নিমেষের জন্য নড়েনি ! তার মৃত্যুর পর কলোশভ এক-সপ্তা নিজের ঘরে পড়েছিল···বেরোয়নি মোটে। বেচারী গাব্রিলভের মৃত্যুতে আমরা সকলেই মনে-মনে বেদনা বোধ করছিলুম। বেচারীর সেই বিবর্ণ মুখ···রোগের যাতনা···আমরা ভয়ে শিউরে থাকতুম ! কেবলি মনে হতো, মৃত্যু আমাদের কাছাকাছি ঘুরছে ! একটু সুযোগ পেলেই···

যখন বেঁচে ছিল, তার উপর আমার হিংসা-আক্রোশের সীমা ছিল

না। তা থাকলেও তার বিয়োগ-বেদনা আমার মনে তীরের মতো বিঁধে ছিল! এ বেদনায় সান্ত্বনা ছিল এই যে কলোশভ আর আমার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তা এবার ঘুচেছে!

একদিন সন্ধ্যাবেলা···আমার জীবনে সে-সন্ধ্যা চির-স্মরণীয় হয়ে আছে,—আমার ঘরে আমি একা সোফায় শুয়ে আছি···দৃষ্টি কড়িকাঠে নিবদ্ধ ···কে যেন ছুটে এসে বাহিরে দাঁড়ালো···ঠিক আমার ঘরের দোরের সামনে। দোর খোলা ছিল···মুখ ফিরিয়ে দোরের দিকে চেয়ে দেখি,—কলোশভ!

উঠে বসলুম। কলোশভ এসে আমার পাশে সোফায় বসলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললে—তোমার কাছে এলুম।···তার কারণ আমার উপর তোমার দরদ আর-সকলের চেয়ে বেশী।···আমার প্রিয়তম বন্ধুকে জন্মের মতো হারিয়েছি···

কলোশভের কণ্ঠ স্খলিত হলো বাষ্পোচ্ছ্বাসে। নিশ্বাস ফেলে সে বললে,—নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ, একা, অসহায় মনে হয়।···গাব্রিলভকে তোমরা কতটুকুন্ জানতে! কেউ তাকে জানতে না ·····

এই পর্যান্ত বলে কলোশভ উঠে দাঁড়ালো···অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলো। আমি কাঠ হয়ে বসে···দৃষ্টি কলোশভের উপর নিবদ্ধ।

কলোশভ এলো কাছে,···বসলে,—বসে আমার পানে চেয়ে বললে,—তার জায়গা তুমি পূরণ করবে?···বলে একখানা হাত আমার দিকে প্রসারিত করে' দিলে।

আমার মাথায় রক্ত ছলাৎ করে উঠলো। উল্লসিত আবেগে কলোশভকে আমি জড়িয়ে ধরলুম···তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলুম না।

কি জবাব দেবো ?···আমার একান্ত যে কামনা···কলোশভ বুঝেছিল আমার মন। আমার বাহু-বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সে মুক্ত করলে···করে' উঠে দাঁড়ালো···আমার পানে চেয়ে রইলো একাগ্র অভিভূত দৃষ্টিতে।···

তারপর একসঙ্গে দুজনে বসে চা খেলুম। চা খেতে খেতে গাব্রিলভের কথা হলো।···শুনলুম, গাব্রিলভ একবার কলোশভের প্রাণ রক্ষা করেছিল। নিশ্বাস ফেলে কলোশভ বললে,—আমি কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলুম না।

গাব্রিলভের আসনে আমায় বসাবে কলোশভ···শুনে গর্ব্বে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো আটটা। কলোশভ উঠলো··· উঠে খড়খড়ির ধারে গেল। সার্শি বন্ধ ছিল···সার্শির কাঁচে কটা টোকা মারলো· তার পর হঠাৎ আবার আমার কাছে এলো···কি বলতে যাচ্ছিল, বললে না···একখানা চেয়ারে বসলো···বসে নির্বাক রইলো।

কলোশভের হাত ধরে আমি বললুম—সত্যি আমাকে প্রাণের বন্ধু বলে' গ্রহণ করতে পারবে, কলোশভ ?

কলোশভ আমার পানে তাকালো···অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো···তার পর বললে—যদি বলি, হ্যাঁ ?

বললুম—খুব খুশী হবো তাহলে।

কলোশভ বললে—তাহলে তোমার টুপিটা নাও···নিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

কলোশভ বললে—গাব্রিলভ কিন্তু কখনো প্রশ্ন করতো না·· নিঃশব্দে সঙ্গে আসতো।

আমি নিরুত্তর।

কলোশভ বললে—তুমি তাস খেলতে জানো?

—জানি।

—তাহলে দেরী নয়···এসো।···

দুজনে বেরুলুম। পথে একখানা গাড়ী ডেকে গাড়ীতে উঠে বসলুম।

এলুম একেবারে সহরের ফটকে। গাড়ী থেকে নামলুম। তার পর কলোশভের সঙ্গে হাঁটন্। সে চলেছিল আগে-আগে···বেশ ক্ষিপ্র গতি ···আমি চলেছি তার পিছনে।

বড় রাস্তা ধরেই চলেছিলুম। আধ মাইল চলার পর মোড় নিলুম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে তখন রাত্রি নেমেছে। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। সে কুয়াশা ভেদ করে রাস্তায় বাতিগুলো মনে হচ্ছিল যেন রোগীর ঘোলাটে চোখ! ঘোলাটে সে-আলোয দেখলুম, সহরের প্রকাণ্ড গির্জ্জা-ঘর। বাঁয়ে মাঠ···মাঠে দুটো সাদা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে সেই রাত্রে! মাঠের পর ক্ষেত · কুয়াশার পর্দ্দায় ঢাকা।

আমরা চলেছি নিঃশব্দে। অনেক দূর গিয়ে কলোশভ হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। তার পর সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—এই বাড়ী!

চেয়ে দেখি, সামনে ছোট একখানা বাড়ী···জীর্ণ···দুটো জানলা খোলা···খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। ঘরে আলো জ্বল্‌ছে···সে-আলো বাহিরের কুয়াশা ভেদ করে পথে এসে পড়েছে!

কলোশভ বললে—এই বাড়ী। এ বাড়ীতে এক ভদ্রলোক থাকেন-নাম সিদোরেস্কো। লেফ্‌টেনাণ্ট ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।

তিনি এখানে থাকেন, আর তাঁর সঙ্গে থাকেন তাঁর বোন···বৃদ্ধা কুমারী ···আর মেয়ে, তোমাকে আমার খুড়তুতো ভাই বলে এখানে আমি পরিচয় দেবো, বুঝলে!···এখানে তাস খেলতে হবে।···খেলবে তো?

মাথা নেড়ে জানালুম, খেলবো।···এর কারণ কলোশভকে আমি প্রমাণ দিতে চাই, বন্ধুত্বে গাব্রিলভের চেয়ে খাটো নই আমি।··· আপনাদের কাছে গোপন করবো না, আমার কৌতূহলও অদম্য হয়ে উঠেছিল।

বাড়ীতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, হঠাৎ ঘরের জানলার দিকে চোখ পড়লো। ঘরে আলো জ্বলছে···সে আলোয় দেখি, জানলায় দাঁড়িয়ে এক তন্বী কিশোরী! মনে হলো, আমাদের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে! আমাদের দেখবামাত্র কিশোরী জানলা থেকে সরে অদৃশ্য হলো।

দোতলায় উঠলুম। সামনে সরু প্যাসেজ · অন্ধকার ঘুরঘুট্টি! এক কুঁজো বুড়ী এসে সামনে দাঁড়ালো। তার হাতে বাতি···এবং চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

কলোশভ জিজ্ঞাসা করলে—আইভান সেমিয়োনিচ, বাড়ীতে আছেন?

বুড়ী বললে,—আছেন।

বুড়ীর কথার প্রতিধ্বনি তুলে ওদিকে ঘরের ভিতর থেকে পুরুষ-কণ্ঠ ধ্বনিত হলো—হ্যাঁ···হ্যাঁ···বাড়ীতে আছি।

ভিতরে ঢুকে ভোজন-কামরায় আমরা বসলুম। নোংরা ··টানা লম্বা ঘর। ভোজন-কামরা বলে পরিচয় না দিলে দেখে বোঝা যায় না সেটা ভোজন-কামরা। কোণে একটা ষ্টোভ···তার পাশে ধুলো-ঝুল আবর্জ্জনার মধ্যে একটা পিয়ানো খাড়া করা···দেওয়াল ঘেঁষে কখানা

চেয়ার···পালিশ উঠে চেয়ারগুলোর চেহারা যা হয়ে আছে···যেন কুষ্ঠরোগী! ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক। তাঁর পিঠটা বেঁকে গেছে। বয়স পঞ্চাশ। ভদ্রলোকের গায়ে একটা ড্রেসিং-গাউন। ড্রেসিং-গাউনটা তেল-চকচকে। একাগ্র দৃষ্টিতে ভদ্রলোককে এক ঝলক দেখে নিলুম। মুখে বহু বৎসরের পুঞ্জিত বেদনার ছায়া যেন! মাথার চুলগুলো কড়া ব্রাশের মতো খোঁচা-খোঁচা এবং খাড়া···ছোট্ট কপাল···ধূসর চোখ···নাকের নাচে বিরাট একজোড়া গোঁফ···ঠোঁট দুটো বেশ পুরু।

ভাবলুম, চৎকার সঙ্গী···চমৎকার জায়গা।

ভদ্রলোক বললেন—অনেক দিন পরে দেখা···এ্যা···আঁদ্রে? মনে হচ্ছে যেন এক যুগ পরে!···তা সেবাস্তিয়ান্ সেবাস্তিয়ানো কোথায়? আসেনি?

জড়িত কণ্ঠে কলোশভ বললে,—না···গাব্রিলভ মারা গেছে!

—মারা গেছে!···ভদ্রলোক চমকে উঠলেন! বললেন—বলো কি!··· তা এ ভদ্র লোক···

কলোশভ আমার পরিচয় দিলে তার আত্মীয় বলে'। বললে,—আমার খুড়তুতো ভাই···এঁর নাম নিকোলে আলেক্সি।

—বেশ, বেশ···খুশী হলুম।···আইভান সেমিয়োনিচ বললেন—ইনি তাস খেলতেন জানেন তো?

কলোশভ বললে,—নিশ্চয়।

—তাহলে আর দেরী কেন! এখনি বসা যাক।···এই,···আহা, মেট্রোনা সেমিয়োনোভনা গেল কোথায়? আঃ! তাস খেলার টেবিলটা আমাদের···শীগগির···শীগগির!···আর চা···

কথাটা শেষ করে' সিদোরেঙ্কো গেল পাশের ঘরে।

কলোশভ চাইলো আমার পানে, মৃদু কণ্ঠে বললে,—শোনো··· তুমি ঠিক বুঝবেনা ভাই, এতে আমি কতখানি লজ্জা পাচ্ছি!

আমি তাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করলুম।

পাশের ঘর থেকে সেমিয়োনিচ্ ডাকলো—এসো হে···আর ও ভদ্রলোকের কি নাম বললে? উনিও···আসুন···এই ঘরে··

দুজনে গেলুম পাশের ঘরে। এটা ড্রয়িং-রুম। খাবার কামরার চেয়ে এ কামরাটি আরো ছোট। দেওয়ালগুলোর গায়ে প্রকাণ্ড ক'খানা ছবি। সামনে জীর্ণ একখানা সোফা।···সোফার ভিতরকার তুলো পিণ্ডি পাকিয়ে ঠেলে-ঠেলে জায়গায় জায়গায় আঁঠি বেঁধে আছে। দেখি, এই সোফাতে বসে সেমিয়োনিচ্ নিবিষ্ট মনে তাস ভাঁজচেন! তাঁর কাছে একখানা নীচু চেয়ারে বসে এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক···পরণে কালো রঙের গাউন···সে কালো রঙও মাঝে মাঝে ছ্যাব্‌কা হয়ে গেছে···মাথার সাদা ক্যাপ। স্ত্রীলোকটির চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মতো···ঠোঁট দুটি পাতলা।

সেমিয়োনিচ বললে—এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। হ্যাঁ, ভালো কথা, সে ভদ্রলোকটি মারা গেছে! আঁদ্রে নিকেলোভিচ্ তাই তাঁর এই খুড়তুতো ভাইকে এনেছে।···দেখা যাক, ইনি কেমন খেলেন!

দেহখানা একটু নেড়ে প্রৌঢ়া কেশে গলা সাফ করে' নিলে।

চারিদিকে আমি একবার তাকালুম। দেখি, কলোশভ কোন্ ফাঁকে এর মধ্যে এ-ঘর থেকে সরে গেছে।···আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছি, গেল কখন···হঠাৎ সেমিয়োনিচ উঠলো খিঁচিয়ে—আঃ, তোমার খক্-খক্ কাসি থামাবে মেট্রোনা সেমিয়োনোভনা? ভেড়ার কাসি যেন!

আমি বসলুম। খেলা আরম্ভ হলো।

খেলায় ভয়ানক ভুল করছিলুম। সে-ভুলের জন্ম সিদোরেঙ্কোর কি খিঁচুনি···বোনকে যা-তা গালাগাল···বোন কিন্তু নিঃশব্দে সে গালাগাল পরিপাক করছে। বুঝলুম, এমনি দস্তুর এবং এ দস্তুর বহুকাল থেকে চলে আসছে···এ সব গালাগাল বোনের সয়ে গেছে···সে এ-সব গায়ে মাখে না।···

কিন্তু এমনি গালাগাল দিতে দিতে হঠাৎ যখন সেমিয়োনিচ বোনকে বলে বসলো,—খৃষ্টের দুশমণ···কাফের! বোন তখন আর চুপ করে' সহ্য করতে পারলো না। দাউ-দাউ করে' জ্বলে উঠলো! বোন বললে—আইভান সেমিযোনিচ···ভুলে গেছ···এমনি লাগাগাল দিয়ে একদিন নিজের বৌটাকে মেরেছো!···আমাকেও তেমনি করে' মারতে চাও? ·· কিন্তু আমি তা হতে দিচ্ছি না···খেয়াল রেখো।

বেশ খানিক অপ্রতিভ কণ্ঠে সেমিয়োনিচ্ বললে—বটে?

—তা নয় তো কি! হক্ কথা বলবো, তাতে পরোয়া করবো কার, শুনি?

দু'চোখ পাকিয়ে সেমিয়োনিচ্ তুললো হুঙ্কার,—হুঁ!

বোনও ঝঙ্কার তুললো, বললে,—হ্যাঁ···হ্যাঁ···হ্যাঁ—এর মধ্যে কোনো লুকোছাপা আছে না কি? আমাকেও তেমনি করে সরাবে, ভেবেচো! কিন্তু এত ঠুনকো আমি নই···জেনো।

সেমিয়োনিচের চোখের আগুন আরো প্রখর হলো। সে বললে,—ফের!

বোন বললে—কাকে অমন চোখ রাঙাও···উঁ! রোগে মরতে পারি··· কিন্তু তোমার ভয়ে মরবো না আমি, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো!

এমনি বাকযুদ্ধ চললো দুজনে···অনেকক্ষণ। আমার অবস্থা তখন বুঝতে পারছেন, ন যযৌ ন তস্থৌ···অর্থাৎ উঠতে পারলে বাঁচি কিন্তু

উঠতে বাধচে!...উঠে গেলে অভদ্রতা ..বসে থাকলে রাগে জ্বলা... সমস্যা! এখানে আমাকে কেন যে আনলো কলোশভ সে-ও এক সমস্যা! তাস খেলায় কোনোদিনই আমার সখ নেই...তাস খেলায় ওস্তাদী বা ঝোঁকও কখনো দেখেনি কলোশভ। খেলতে বসে প্রতিক্ষণে নিজেকে আনাড়ি বুঝে অস্থির হচ্ছিলুম।

খেলার মাঝখানে সেবাস্তিয়ানোভিচ হঠাৎ এক সময় বলে উঠলো—ধেত্তেরি, একদম আনাড়ি তুমি!

মনে মনে তার পরলোক কামনা করছিলুম...নিজেরও চূড়ান্ত রকম নরক-যন্ত্রণা-ভোগ! এ যাতনাভোগ চললো ঝাড়া দুটি ঘণ্টা। আমার হলো তাস খেলায় হার—যাকে বলে গো-হারান একেবারে!

এমন সময় পিছনে খুট্ করে একটা শব্দ। চেয়ে দেখি, কলোশভ আমার চেয়ারের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আর কলোশভের পিছনে এক সপ্তদশী কিশোরী। কিশোরীর মুখে সলজ্জ হাসি। কিশোরী আমার পানে চেয়েছিল।

সেমিয়োনিচ্ হাঁক দিলে—আমার পাইপ ভরে' দে ভারিয়া...

কিশোরী সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো পাশের ঘরে।

সুন্দরী ঠিক নয়...রঙটা ফ্যাকাশে-পানা...রোগা...কিন্তু মাথায় একেবারে চুলের রাশি। অপূর্ব্ব সে চুল! চুলের এমন শোভা এর আগে আর কোথাও দেখিনি। আর চোখ দুটি...অপরূপ!

সে-দানের খেলা চুকলে হারের কড়ি গুণে চুকিয়ে দিলুম। সিদোরেঙ্কো পাইপ ধরালো ..পাইপে দু চারটে টান দিয়ে কেমন যেন খুঁৎখুঁৎ করতে লাগলো...শেষে বললে—খাবার সময় হয়েছে, না?

ভারিয়ার সঙ্গে কলোশভ আমার পরিচয় করিয়ে দিলে ..আইভান সেমিয়োনিয়ের মেয়ে বার্বারা আইভানশোভনা।

ভারিয়া লজ্জায় নতমুখী···সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে সে লজ্জা তাকে যেন নিথর নিস্পন্দ করে' রেখেছে! আমিও লজ্জায় জড়োসড়ো!

ক' মিনিটেই লজ্জা-সঙ্কোচ কেটে দুজনেরই হলো সহজ ভাব। ভারিয়াকে পিয়ানোর সামনে বসিয়ে কলোশভ বললে—স্বরে অনুরোধ—একটা নাচের গৎ বাজাও ভারিয়া···

ভারিয়া ধরলো নাচের গৎ···তার সুরে কলোশভ নাচলো···একটা কশাক্ নাচ ··আইভান সেমিয়োনিচ্‌ও দিলে সে নাচে যোগ।

নাচতে নাচতে সেমিয়োনিচ্ কতবার যে বেতালা হলো! বোন মেট্রোনা তা দেখে হেসে খুন! বোন তার পর বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। কুঁজো বুড়ী দাসী এসে টেবিলে প্লেট সাজালো। আমরা খেতে বসলুম।

খেতে খেতে কলোশভ রাজ্যের আজগুবি গল্প ফেঁদে বসলো। সে গল্পে লেফ্‌টেনান্টের কি সে হাস্যরোল···যেন পাঁচ-ছ বছরের ছেলে সে! মাঝে মাঝে আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি ভারিয়াকে তার দৃষ্টি কলোশভের উপর দৃঢ় নিবদ্ধ···পলকের জন্য সরে না! এবং তার সে-দৃষ্টি দেখে আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না, সে-ই যে শুধু কলোশভকে ভালোবাসে তা নয়, কলোশভও তার প্রেমে বিভোর!

ভারিয়ার ঠোঁট দুটি একটু খোলা ··মাথা সামনের দিকে হেলানো··· সারা মুখে লজ্জার রাঙা আভা সে-আভা পলকে ফুটছে, পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে—মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ··

হঠাৎ মুখ নামিয়ে ভারিয়া একটু হাসলো···আপন-মনে···বেশ খুশীর হাসি ··অতি-মৃদু হাসি!

কলোশভের কথা ভেবে মনে-মনে আমি খুশী হলুম। সঙ্গে সঙ্গে হিংসার হুলও একটু মনে বিঁধলো!

খাওয়া-দাওয়া চুকলে কলোশভ আর আমি উঠলুম···উঠে নিজের নিজের টুপি নিলুম হাতে। মস্ত হাই তুলে লেফ্‌টেনাণ্ট বললে,—হ্যাঁ, অনেক রাত হলো · এখন তাহলে এসো।

ভারিয়া এলো সদর পর্যান্ত কলোশভকে এগিয়ে দিতে। বললে,—আবার কবে আসছো, আঁদ্রে ?

কলোশভ জবাব দিলে—শীগগিরই।

আমাকে উদ্দেশ করে' ভারিয়া বললে,—এঁকেও নিয়ে এসো।

—নিশ্চয়। কলোশভ দিলে জবাব।

মনে মনে আমি বললুম শ্লেষ-ভরে—ইঃ একেবারে চিরানুগত ভৃত্য !

বাড়ী ফেরবার পথে শুনলুম এক দীর্ঘ কাহিনী···

দু'মাস আগে সিদোরেঙ্কোর সঙ্গে হয় তার আলাপ···আশ্চর্য্য রকমে। বর্ষা-কাল···সন্ধ্যার সময় কলোশভ পাখী শীকার করে' ফিরছিল··· হঠাৎ কাছে শুনলো গোঙানি শব্দ। হাতে বন্দুক আছে, ভয় কি··· ভেবে কলোশভ গেল দেখতে। গিয়ে দেখে, মাটীতে লুটিযে পড়ে এক ভদ্রলোক গোঙাচ্ছেন। ভদ্রলোকের হাঁটু ভেঙ্গে গেছে। এই ভদ্রলোকটিই সিদোরেঙ্কো। অতি কষ্টে তাঁকে তুলে কলোশভ তাঁর বাড়ীতে তাঁকে দিলে পৌছে তাঁর ঐ বোন আর মেয়ের কাছে। পৌছে দিয়েই ছুটলো ডাক্তার ডাকতে।···এইতেই রাতটুকু গেল কেটে। সকল হলো···ক্লান্তি আর অবসাদের ভারে কলোশভের দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই! মেট্রোনা এক রকম জোর করে কলোশভকে ড্রয়িং রুমে সোফায় শুইয়ে দিলে। শোবামাত্র ঘুম। সে-ঘুম ভাঙ্গলো বেলা আটটার পর। জেগে উঠতেই বাড়ী ফিরবে, বোন আর মেয়ে তাকে ছাড়লো না···বসিয়ে চা খাওয়ালো। রাত্রে বার্বারার কাতর মলিন

মূর্ত্তি···মৌন পাণ্ডুর মুখ···অনেকখানি মমতা জাগিয়ে তুলেছিল কলোশভের মনে! সকালে দেখলো সে-মুখে আনন্দের দীপ্তি। মেট্রোনা বার-বার ধন্যবাদ জানালো—কলোশভের মহত্ত্বের বহু স্তুতি করলে। বার্বারা নত মুখে নীরবে পেয়ালায় চা ঢাললো···লজ্জা-কম্পিত হাতে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলে কলোশভের সামনে···তার পর শুধু ছোট একটি প্রশ্ন,—কতটা চিনি দেবো?···সে-প্রশ্নের উত্তর পেয়ে পেয়ালায় মিশিয়ে দিয়েছিল দু-চামচ চিনি।

চা খাচ্ছে, লেফটেনাণ্টের ঘুম ভাঙ্গলো···শোবার ঘর থেকেই জলদ কণ্ঠে ডাক এলো,—বোনের নাম ধরে'। সে-ডাকে বোন গেল ছুটে লেফটেনাণ্টের কাছে। বেশ উঁচু গলায় লেফটেনাণ্ট বললে,—পাইপ··· আমার পাইপ!···মেট্রোনা পাইপ দিলে। সে-পাইপে দু-তিন টানের পর বোনকে প্রশ্ন করলে লেফটেনাণ্ট,—সে-ছোকরা চলে গেছে?···আহাহা, ছোকরার নামটা মনে পড়ছে না তো!

এ-কথা শুনে চায়ের টেবিলে বসেই কলোশভ উচ্চকণ্ঠে জানালো, —না, সে চলে যায়নি এখনো···

সঙ্গে সঙ্গে উঠে কলোশভ শয়ন-ঘরের দ্বারে এলো···জিজ্ঞাসা করলে,—একটু ভালো বোধ করছেন এখন?

লেফটেনাণ্ট বললে,—হ্যাঁ। তা দোরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন না মশাই।···

তখন কলোশভ ঢুকলো ঘরে। অনেকক্ষণ ধরে' কলোশভকে দেখে দেখে সিদোরেঙ্কো বললে,—অনেক ধন্যবাদ মশাই। মাঝে মাঝে আসবেন এখানে···আমাদের বন্ধু হলেন।···তা ভালো কথা, আপনার নামটা···তাইতো?

আঁদ্রে নাম বললে। শুনে লেফটেনাণ্ট বললে—বেশ, বেশ, তা

মাঝে মাঝে আসবেন কলোশভ সাহেব!…এখন তাহলে আসুন আপনি …না, আপনাকে এখন আর দরকার হবে না…আপনার বাড়ীর লোকরা ওদিকে কত ভাবছেন আপনার জন্য।

এ-কথার পর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলো…এবং সন্ধ্যার সময় মন তাকে টেনে নিয়ে এলো আবার এখানে লেফটেনান্টের গৃহে। —এবং সেই থেকেই এ-বাড়ীতে কলোশভের যাতায়াত সুরু।… প্রথমে খুব দেরীতে দেরীতে যেতো। হপ্তায় একদিন…তার পর হপ্তায় তিন-চার দিন করে'—শেষে প্রত্যহ। গ্রীষ্মকালে কলোশভ আগে শীকারে বেরুতো মাঝে-মাঝে একেবারে নিয়ম করে'—সকলে তা জানে। বন্দুক আর হ্যাপশাক নিয়ে সকালে বেরুতো। সেই দিন থেকে তার শীকারে যাওয়া বন্ধ…বন্দুক আর হ্যাপশাক নিয়ে তেমনি বেরোয়, তবে শীকারে যায় না, সোজা আসে এখানে লেফটেনান্টের বাড়ীতে। এসে এই বাড়ীতেই দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরে।…লোকে জানে, শীকার করেই ফিরলো কলোশভ!… ইদানীং এই ভাবেই তার শীকার করা!

বার্বারার বাপ মিলিটারীতে লেফ্‌টেনাণ্ট ছিলেন বিশ বছর…টাকাও কিছু করেছেন… মস্কো থেকে দেড় মাইল দূরে এক গ্রামে জমিও খানিকটা কিনেছেন। লেখাপড়া জানেন না বললেই চলে। তাঁর বাইরেটা রুক্ষ কদর্য্য হলেও আসলে চতুর ব্যক্তি।…এ যুগের রাশিয়ানদের মতোই ধূর্ত্ত এবং নিজের স্বার্থে সম্পূর্ণ সচেতন। ভয়ানক আত্মম্ভরী; স্বার্থপর…ষাঁড়ের মতো একগুঁয়ে জেদী,—ভদ্রতা বিনয় সৌজন্যের কোনো ধার ধারেন না…বিশেষ করে' অজানা, অচেনা ভদ্র-সাধারণের সঙ্গে আচরণ অত্যন্ত বিশ্রী। সকলকে অবিশ্বাস। দুনিয়ার সব মানুষকে

দারুণ অবজ্ঞা করেন। আদুরে ছেলের মতো খেয়ালের অন্ত নেই। কারো সঙ্গে আলাপ নয়, বন্ধুত্ব নয়···যার কাছ থেকে যেটুকু আদায় হয়, সেইদিকে লক্ষ্য! অর্থাৎ স্বার্থ নিয়েই শুধু কারবার!···

আমরা একদিন বিবাহের কথা নিয়ে খানিকটা আলোচনা করছিলুম। লেফটেনাণ্ট হুম্ করে বলে উঠলেন—বিবাহ! হুঁঃ, আমার মেয়ের বিবাহ আমি কার সঙ্গে দেবো? পাত্র কৈ? সব ভাঁড়···তা ছাড়া বিবাহ কেন দেবো?···মেয়েটাকে ধরে' মারবে পিট্‌বে বৈ নয়···স্বামীর ঐ এই কাজ ···আমার স্ত্রীর উপর আমিও তো এমনি জুলুম করেছি!

এই লেফটেনাণ্টের গৃহে কলোশভের এখন নিত্য যাতায়াত। বুঝলুম, এ যাওয়া···লেফটেনাণ্ট বা মেট্রোনার জন্য নয়, তার যাওয়া কিশোরী বার্বারার জন্য!

যাক্···আঁদ্রে আরো যা বলেছিল, তার মর্ম্ম:

একদিন···তখন সন্ধ্যা···আঁদ্রে আর বার্বারা বাগানে বসে গল্প করছে, এমন সময় সেমিয়োনিচ্ হঠাৎ বাগানে এসে হাজির। দুজনকে এক সঙ্গে দেখে দু'চোখে বিরক্তি ভরে' সে আঁদ্রেকে বললে—শোনো বাপু, আমার স্পষ্ট কথা···তুমি ভারি মজা পেয়েছো···না? আমি বুড়ো হয়েছি, অথর্ব্ব হয়েছি···ভাবো, আমি কিছু বুঝি না? তাই যখনই আসবে, তখনি আমার সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে একধারে বসে ফিশ্-ফিশ্! ···ও-সব চলবে না!···আমার ঐ এক সন্তান···তাকে ভোলোবে তুমি? না, না, না···এখানে আসতে চাও যদি, সঙ্গে একজন বন্ধু, কি, ভাইটাইকে এনো···না হলে একা-একা আমার মেয়ের সঙ্গে বসে তোমাকে ফুশ-ফুশ গুজ্-গুজ্ করতে দেবো না। ওর সঙ্গে মিশতেও দেবো না। ভদ্রঘরের মেয়ে···বাইরের ছেলেদের ফষ্টি-নাষ্টি কি প্রেম করবার টার্গেট্‌ নয়! বুঝলে!···কথাটা লেফটেনাণ্ট বলেছিল দুজনকে শুনিয়ে। তার পরের

দিন থেকে এ-বাড়ীতে কলোশভের আসা সুরু হলো গাব্রিলভকে সঙ্গে নিয়ে!...এসে কলোশভ আর গাব্রিলভ...দুজনকেই লেফটেনাণ্টের সঙ্গে তাস খেলতে বসতে হতো।

দীর্ঘ কাহিনী শুনলুম...গাব্রিলভ আজ নেই, তাই এখানে আনবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হয়েছে কলোশভের!

কাহিনী শেষ করে' কম্পিত কণ্ঠে কলোশভ বললে,—গোপন করবো না...ভারিয়াকে আমি ভালোবাসি...দিনে একটি বার ওকে না দেখলে আমার মন হু-হু করে! অমন মেয়ে দেখা যায় না!... তোমাকেও ভারিয়া খুব পছন্দ করে।

হাঁ, একটা কথা বোধ হয় বলতে ভুলেছি...মানে, তখনও পর্য্যন্ত মেয়েদের নামে আমার কেমন হৃৎকম্প হতো...পারত-পক্ষে মেয়েদের সঙ্গ-সাহচর্য্য আমি এড়িয়ে চলতুম।—তা করলেও একান্তে বসে স্বপ্ন-রচনায় ত্রুটি ছিল না। কিশোরীর রূপ, কিশোরীর চোখে বিলোল চাহনি ...কিশোরীর ভালোবাসা...কিশোরীর সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে বিজনে বিচরণ ...আমি ভালোবাসবো একজন কিশোরীকে...কিশোরী ভালোবাসবে আমাকে...অর্থাৎ যৌবনে সব-প্রথম যে-কামনা আমাদের...মনে জাগে, যৌবনের যা ধর্ম্ম—ঐ-সব কল্পনায় আমি বিভোর থাকতুম! কিশোরী বার্বারার সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হলো। তার সঙ্গে মেশা, তার সঙ্গে কথা কওয়া...দায়ে পড়েই করতে হতো। খুব সাধারণ মেয়ে বার্বারা। তবু মনে হতো, রাশিয়ায় তার মতো মেয়ের সাক্ষাৎ কচিৎ-কখনো মেলে।...আপনারা প্রশ্ন করবেন, কেন? জবাবে আমি বলবো, বার্বারার মধ্যে এতটুকু অস্বাভাবিকতা বা ন্যাকামি কখনো দেখিনি! তার আগা-গোড়াই সহজ, সরল, স্পষ্ট...তার কোনোখানটায় হেঁয়ালি নেই...তাকে বুঝতে দেরী হয় না যেমন, কষ্টও হয় না তেমনি।...তার

মুখে সব-সময়ে কেমন একটু মলিন ছায়া যেন···তার কারণ মনে হতো, যত ভালোই হোক···বড় ঘরে আসন বা মর্য্যাদা তার মিলবে না আমাদের সমাজে! তার হাসিটুকু আমার ভারী মিষ্টি লাগতো। সরল মন, সহজ কথা···আমার মনে বেশ সুদৃঢ় রেখা এঁকেছিল! তাকে দেখে বিরাট কোনো সম্ভাবনার কথা মনে জাগতো না···তবু মনে হতো পৃথিবী একটি বার শুধু এ-মেয়েটির পানে চেয়ে দেখুক···মুগ্ধ হতেই হবে পৃথিবীকে! এখনকার কথা···মানে, এখন আমার এ-বয়সে মনে হয়, বার্বারাকে দেখে কেউ থমকে দাঁড়াবে না···তার মধ্যে মোহ-সৃষ্টি করবার কিছু নেই। কিন্তু তখন···? পথে যেতে বার্বারাকে দেখলে থামতেই হবে—ভালো করে' যতখানি তাকে দেখা যাব···ততখানি দেখবার জন্য! ···তার পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে না-তাকিয়ে চলে যাবে, এমন মানুষ দুনিয়ায় জন্মায় নি, মনে হতো! মনে হতো, তাকে দেখে তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য অধীর হবেই হবে!

আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন, বয়সে তরুণ···এ বয়সে কোনো কিশোরীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন নিশ্চয় এবং মনে-মনে ভালোও বেসেছেন নিশ্চয়—কাজেই আপনারা বুঝতে পারবেন, কি করে' ভালোবাসা আমাদের মনে অঙ্কুরিত হয়ে সমস্ত মনে শিকড় বিছিয়ে বেড়ে ওঠে! অতএব বার্বারাকে দেখে সে-বয়সে অবমার মনে কি হয়েছিল, তা সবিস্তারে না বললেও চলবে!···

কলোশভের সঙ্গে আমি নিত্য সহচর হলুম সেমিয়োনিচের গৃহে··· তাসের নামে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত থাকলেও সেখানে বার্বারার সান্নিধ্য পাবো, সেই নেশায় কণ্টক-শয্যাও আরামের বলে' সহ্য করতে পারতুম, তাসখেলা তো তুচ্ছ! মন আমার দিনে-দিনে বার্বারাকে কেন্দ্র করে' কি নিগড় সৃষ্টি করচে, বুঝেও মনকে নিবৃত্ত করবার

এতটুকু চেষ্টা করিনি! ভালোবাসার মর্ম্ম মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে' আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে উঠছিলুম। বার্বারাকে দেখে যে-আনন্দ পেতুম, তেমন আনন্দ আর কোনো-কিছুতে ছিল না আমার!···যখন দূরে থাকতুম, তার চিন্তায় তার ধ্যানে মন আমার পরিপূর্ণ থাকতো!···এ ভালোবাসা আমি বুকে লালন করতে লাগলুম নীরবে। মনে কলোশভের উপর হিংসা পুঞ্জিত হয়ে উঠছিল···সে হিংসাকে নিজের মনেই চেপে রাখতুম।···বার্বারার চিন্তায় কোনো রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি—খিদে তেষ্টাও ত্যাগ করিনি! কিন্তু জাগরণে সব-সময় একটা চিন্তা মনকে ছেয়ে থাকতো! কখন সন্ধ্যা হবে, সেমিয়োনিচের ওখানে যাবো···বার্বারাকে দেখবো···তার সঙ্গে হাসি-গল্প করবো···চায়ের পেয়ালা নেবার সময় তার করস্পর্শে কতখানি আরাম পাবো···ভিড় করে' মনে কত-রকমের স্বপ্নই যে উদয় হতো···সে-সবের বর্ণনা এখন সম্ভব নয়!

একদিন দেখি, বাগান থেকে ফিরচে কলোশভ আর বাবারা··· বার্বারার মুখে লজ্জায় রক্ত আভা···বাবারা মৌন মূক। বুঝলুম, প্রণয়-সুধার স্পর্শ! মনে যেন হাজারখানা ছুরি বিঁধলো···নীরবে সে-যাতনা ভোগ করেছি!

বুঝতুম, বাবারার নিজের প্রাণ বলে' মন বলে' কিছু নেই···তার প্রাণ-মন সে মিলিয়ে দেছে, মিশিয়ে দেছে কলোশভের প্রাণে-মনে ···কলোশভের জীবনেই তার জীবন। কবিতায় পড়েছিলুম,— রাত্রের মলিন পদ্ম···সকালের সূর্য্য-কিরণ পেয়ে উজ্জ্বল রাগে উছল হয়ে ওঠে! চোখে দেখতুম, সারাদিনের অদর্শনে মলিন বার্বারা সন্ধ্যার পর কলোশভকে দেখবামাত্র আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! আঁদ্রের সঙ্গ পেয়ে তার কতখানি আনন্দ!···আঁদ্রে কিন্তু নিজেকে

এমনভাবে বিসর্জ্জন দেয়নি! তাকে দেখে মনে হতো, বার্বারার কাছ থেকে দূরে গেলেও সে বার্বারার ধ্যানে আর-সব ভোলেনি···পড়ায় লেখায় হাসি-কথায় গানে-গল্পে সে ঠিক সেই অটুট কলোশভই আছে!

আপনাদের আগেই বলেছি,—সেমিয়োনিচের গৃহে আমি ছিলুম কলোশভের নিত্য-সহচর!···কোনো কোনোদিন লেফটেনাণ্টের মেজাজ ভয়ানক বিগড়ে থাক্‌তো—সেদিন তাস-খেলা বন্ধ!···সেদিন কোণে বসে লেফটেনাণ্ট সবার পানে শুধু তাকাতো···নিঃশব্দে··· গম্ভীর মূর্ত্তি!···তাকে দেখে মনে হতো, যেন প্যাঁচা! প্রথম যেদিন লেফটেনাণ্টের বদ মেজাজ দেখলুম আমি···আর তার জন্ম তাসের টেবিলে বসতে হলো না···সেদিন ভারী আরাম বোধ করেছিলুম কিন্তু। আমার পক্ষে সেখানে থাকা···হলো বিষ!···ভারিয়া আর কলোশভ দিব্যি একদিকে বসে হাসি-গল্পে মশগুল···আমি বেচারী বসে বসে দেখছি তাদের মিলন-উৎসবের আনন্দ! অসহ্য লাগতো। আপনারা আমার সে-অবস্থা নিশ্চয় বুঝছেন!

এমনি ভাবে দিনের পর দিন গড়িয়ে কত দিন যে কাটলো!···ওরা দুজনে সুখে আত্মহারা···কাব্য করে' অপরের সুখোচ্ছ্বাসের অভিনয় দেখবো, এমন সখ আমার কোনো কালেই নেই।···তবু ক্রমে লক্ষ্য হলো, বার্বারার সে বালিকা-সুলভ সহজ সারল্য কিশোরীর গাম্ভীর্য্যে রূপান্তরিত হয়েছে!···সে যেন চঞ্চল হচ্ছে! বুঝলুম, গানের সুর পুরোনো হয়ে এসেছে! অর্থাৎ কলোশভের সে উদ্দাম উচ্ছ্বাস আর নেই ···সে বিহ্বলতার অবসান হয়েছে!···

লক্ষ্য করে' একটু খুশী হলুম। অকপটে স্বীকার করছি, কলোশভের এ-আচরণে তার উপর আমার এতটুকু রাগ হলো না!

আমাদের যাওয়া-আসাতেও ক্রমে ভাঁটা পড়তে লাগলো। প্রত্যহ যেতুম। ক্রমে যাওয়া হতে লাগলো কালে-ভদ্রে···কচিৎ-কখনো! এবং বেশ সুদীর্ঘ-অন্তরালে। যেতুম···বার্বারার সঙ্গে দেখা হতো। লক্ষ্য করতুম তার সে হাসি-ভরা মুখ মলিন···অভিমানের দু-চারটে স্ফুলিঙ্গও উঠতে দেখতুম।

একদিন কলোশভকে জিজ্ঞাসা করলুম—আজ যাবে নাকি হে সেমিয়োনিচের ওখানে?

বেশ সহজ কণ্ঠে সে জবাব দিলে—না···ভালো লাগছে না···যেতে।···

দু-একদিন বার্বারার কথায় কলোশভের অবজ্ঞাও লক্ষ্য করেছি! না, গাব্রিলভের আসন আমি পূর্ণ করতে পারলুম না! আমার চেয়ে সে যেমন অনেকখানি নিরীহ ছিল, তেমনি বুদ্ধিও ছিল তার আমার চেয়ে অনেকখানি কম!

আচ্ছা···এখন একটু অন্য কথা পাড়ছি···ইউনিভার্সিটিতে আমার কজন বন্ধু ছিলেন। তাঁদের একজনের কথা বলি। এ বন্ধুটির নাম শিটভ্। শিটভের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। ইউনিভার্সিটিতে সে তখন আছে দশ বছর। লম্বা টানা মুখ···চোখ দুটো ছোট ছোট··· নাকখানা খাঁড়ার মতো···পাৎলা ঠোঁট, মাথায় এক-মাথা ঘন চুল··· গায়ে গলা-আঁটা ব্রোঞ্জ রঙের লম্বা সার্ট···সে-সার্টের উপর ছিটের ওয়েষ্টকোট···তার চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসছে এখনো! যখন হাসতো সে-হাসির দমকে মনে হতো আকাশখানা বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে···কি জোর হাসি! এখনো কাণে বাজছে তার সেই আকাশ-ফাটা হাসি! সে যে কোথায় না যেতো, বলা কঠিন! অর্থাৎ তার গতি ছিল সর্ব্বত্র···আলোর মতো ··হাওয়ার মতো···বিশেষ করে' যেখানে যত নাচের মজলিশ···সেখানে গিয়ে ঢুঁ মারবেই!···অনর্গল

বকবে, গল্প করবে···গল্প মানে, দুনিয়ার অখ্যাতি !···শুনে রাগে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জ্বলতে থাকতো! কলোশভ্ একদিন বলেছিল—শিটভ যেন নোংরা হোটেল!···এই থেকেই আপনারা তার স্বরূপ বুঝে নিতে পারবেন।·· তবে শিটভ ছিল ভারী চতুর! দুনিয়াকে দেখবার দৃষ্টি ছিল অদ্ভুত···আর সে ছিল বেশ রসিক মানুষ।···যে-সব বন্ধু কবিতা লিখতো, শিটভকে তারা যমের মতো ভয় করতো! তাদের লেখা কবিতা হাতে পড়লে শিটভ সে-কবিতার ব্যাখ্যা যা করতো, সে ব্যাখ্যা শুনলে অতি-গম্ভীর মানুষও হেসে গড়িয়ে পড়তো। একবার আমাদের এক কবি-বন্ধুর লেখা এক কবিতার দুটি ছত্র আউড়ে শিটভ তাকে এমন অতিষ্ঠ করে' তুলেছিল যে বেচারী মস্কো সহর ছেড়ে পালাবার পথ পায় না! সে কখনো পড়তে বসতো না··· টো-টো করেই ঘুরতো !···হঠাৎ সে একদিন লাগলো কলোশভের পিছনে···শ্লেষে-বিদ্রূপে কলোশভকে অহরহ জর্জ্জরিত করতে লাগলো! ···আমার রাগ হলো···আমি তাকে রীতিমত বকলুম···গাল দিলুম··· শেষে তাকে ঘৃণায় বিঁধতে লাগলুম। তাকে স্পষ্ট বললুম—তুমি ওর দাম বুঝবে, সে বুদ্ধিটুকুর জন্য সাত-জন্ম তোমায় তপস্যা করতে হবে শিটভ!···তার জিভে ছুরির ধার·· সকলের সামনে আমাকে বলে বসলো,—থামো, থামো···তোমার কথা কে শোনে! তুমি তো চাটুকার···কলোশভের মোসাহেব···জল উঁচু তো উঁচু···নীচু তো নীচু···এই তো তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি !···হুঁ·· কলোশভের গুণকীর্ত্তন করবে, তাতেও আগে কলোশভের হুকুম নেবে !···যো হুকুম তাঁবেদার ···ফ্যাচ-ফ্যাচ করতে তোমার লজ্জা করে না ?···

এ কথার কোনো জবাব দিলুম না···কথাটা কিন্তু মনে বিঁধে রইলো কাঁটার মতো!

হঠাৎ বার্বারার কথা মনে জাগলো।···তাদের ওখানে যাইনি···প্রায় পনেরো দিন! বুকখানা দুলে উঠলো···কতদিন বার্বারকে চোখে দেখিনি! ভালোবাসা, ভয়, ইজ্জৎ···কটাতে মিলে আমার মনে যেন সংগ্রাম সুরু করে' দিলে! নিশ্বাস ফেলে একা চললুম আইভান সেমিনোভিচের ওখানে···হেঁটে!

কি করে' যে আমার শান্তিকুঞ্জে হাজির হলুম!···মনে আছে, যেতে যেতে পথে কত জায়গায় আমি বসেছি! ক্লান্তির জন্য নয়···মনের তীব্র ভাবাবেগ রুখতে!···

সদব পার হয়ে প্যাসেজে ঢুকলুম···ঘরের সামনে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ালুম···দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল!···

কাকেও ডাকতে হলো না···দোরে দাঁড়াবামাত্র ড্রয়িং-রুমের দরজা খুলে বার্বারা এলো ছুটে···আমার কাছে। বললে—এসেছেন! আঃ··· কিন্তু আপনার বন্ধু? বন্ধু কোথায়? আঁদ্রে নিকোলোভিচ্?

প্রশ্নটা বুকে বাজলো···বার্বারা যেন পাথর ছুড়ে মারলো আমাকে! নির্লিপ্তভাবে বললুম, না, কলোশভ আসেনি।

—আসেননি! বার্বারার মুখে মেঘের ছায়া নামলো···হাসি গেল মিলিয়ে···চোখ হলো ম্লান ছল-ছল!

আক্রোশে জ্বলে উঠলুম! আমি এসেছি···সেজন্য এতটুকু আনন্দ নয়! আমার কোনো দাম নেই? যত দাম সেই কলোশভের!

বললুম,—সে এলো না। বললে, তুমি গিয়ে বলো, জরুরি কাজে আটকে পড়েছি!

কি বলছি, কোনো হুঁশ ছিল না! কথাটা বলে ফেলে বার্বারার পানে চেয়ে দেখবার সাহসও হলো না।

বার্বারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো···নির্বাক···নিস্পন্দ···যেন কাঠের পুতুল!

চোখ তুলে তার পানে চাইলুম।

বার্বারা মাথা নামালো। বড় বড় দুটি জলের ফোঁটা ঝরে' পড়লো তার চোখ থেকে···কপোল বয়ে! মুখে যাতনার রেখা··· তীক্ষ্ণ রেখা।

একটা নিশ্বাস ফেললো বার্বারা···ফেলে আবার আমার পানে চাইলো···সে-দৃষ্টিতে দেখলুম, আমার উপরে বার্বারার কি অখণ্ড বিশ্বাস আর নির্ভর!

আমার বুকখানা দুলে উঠলো। তার একখানা হাত ধরতে গেলুম··· সে ছুটে পালিয়ে গেল।

হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমি ঢুকলুম বসবার ঘরে। সেমিনোভিচ ছিল চুপ করে' বসে···আমাকে দেখে উল্লাস-ভরে বলে উঠলো—এই যে এসো···এসো···আরে!···কিন্তু একা কেন? তোমার ভাই আঁদ্রে?

বললুম—না···একাই এসেছি। বন্ধু···মানে, একটা কাজে ব্যস্ত··· তাই আসতে পারলো না!

হা-হা করে হেসে সেমিনোভিচ উঠে পাশের ঘরে গেল।

এমন বেকুব আমি কখনো হইনি! বিশ্রী লাগলো! কিন্তু উপায় কি? ঘরে আমি পায়চারি করতে লাগলুম···বসলুম না। অবাক হলুম, জরদ্গবটা অমন অট্টহাসি হাসলো কেন?···

মেট্রোনা এলো। তার হাতে আধ-বোনা ষ্টকিং। এসে জানলার ধারে বসলো। তার সঙ্গেই কথা জুড়ে দিলুম।···

চা এলো···বার্বারা চা নিয়ে এলো। তার মুখ যেন পাংশু!···

সিদোরেঙ্কোও এলো।…বার্বারা চা ঢালছে,…কলোশভকে নিয়ে সিদোরিঙ্কোর তামাসা সুরু হলো।

সিদোরেঙ্কো বললে,—আমি জানি…এখানে আসতে ছোকরার এমন বিরাগ কেন এখন! সত্যই তো…ও-বয়সের ছোকরা আমার আর মেট্রোনার লোভে কতদিন এখানে আসবে? আমাদের সঙ্গে কি কথাই বা কইবে…কয়ে আনন্দ পাবে! হা-হা-হা·

পেয়ালাগুলোয় চা ঢেলে দিয়ে বার্বারা নতমুখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার 'দিকে চেয়ে সিদোরেঙ্কো একটা শীষ দিলে। রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো। ভাবলুম, সেমিনোভিচ তাহলে সব রহস্যই জানে!…

আমার মনের কথা সেমিনোভিচ যেন বুঝলো…আমার উপর কী তার তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি! অচপল দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ করে সে মাথা নাড়তে লাগলো…প্রচণ্ড বিজ্ঞের ভঙ্গীতে। গা জ্বলতে লাগলো। চাযের পেয়ালা চট্ করে শেষ করেই আমি উঠে দাঁড়ালুম…বললুম—আজ তাহলে আসি।

লেফটেনাণ্ট নির্বিকারভাবে বললে,—বেশ। আবার দেখা হবে, আশা করি…এবং শীগগিরই?

সে-কথার জবাব না দিয়ে চলে এলুম। লোকটার ভাব-ভঙ্গী দেখে কেমন-একটু ভয় হযেছিল।

অন্ধকার সিঁড়ি। একেবারে নীচের ধাপে নামতেই বরফের মতো ঠাণ্ডা একখানি হাতের স্পর্শ! চমকে উঠলুম…মৃদু কণ্ঠে স্বর শুনলুম—আমি বার্বারা!

আমিও চাপা গলায় বললুম—বুঝেছি।

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বার্বারা আমায় বললে,—আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে···খুব দরকারী কথা। দয়া করে' কাল একবার আসতে পারবেন? একটু সকাল-সকাল···বেলা তিনটে-চারটে নাগাদ? খেয়ে-দেয়ে বাবা ও-সময়ে ঘুমোন্···বাবা জানতে পারবেন না।

বার্বারার হাত নিজের হাতে ধরে' আবেগভরে বললুম—আসবো।

আর কোনো কথা নয়···আমি বেরিয়ে এলুম···এবং সোজা ফিরলুম বাড়ী।

·

পরের দিন বিকেল-বেলা। তিনটের সময় আমি গিয়ে হাজির হলুম সেমিনোভিচের বাগানে। সকালে কলোশভ এসেছিল আমার কাছে···তার সঙ্গে দেখা করিনি।

পরিষ্কার দিন···আকাশে মেঘের বাষ্পও নেই। একটু গরম পড়েছিল···দীর্ঘ ঘাসগুলো বাতাসে দুলছে। কোথায় গাছের ডালে বসে একটা লার্ক ডাকছে। ঐ একটা বুনো খরগোশ গেল ছুটে···বেড়ার ওপারে মাঠ · মাঠে কটা গরু চরছে···

বাগানে পা দিতেই বার্বারার সঙ্গে দেখা। একটা আপেল গাছের নীচে রঙ-চটা ফাটা বেঞ্চ···সেই বেঞ্চে বার্বারা বসেছিল।···বেদনা-বিধুর মূর্ত্তি!

বেঞ্চে বার্বারার পাশে বসলুম।···দুজনের কারো মুখে কথা নেই—অনেকক্ষণ।

গাছের ডাল বয়ে একটা লতা ঝুলে পড়েছে···হাতের নাগালের একেবারে···সেই লতাটা ধরে' বার্বারা আঙুলে জড়াচ্ছিল।

হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেললো। নিশ্বাস ফেলে বার্বারা বললে—আঁদ্রে···?

মৃদু…অস্পষ্ট কথা…কেঁপে বাষ্পোচ্ছ্বাসে মিলিয়ে গেল। চোখ তুলে বার্বারার পানে চেয়ে দেখি, কান্নার বেগ সবলে চাপতে চাইছে বার্বারা…ঠোঁটে ঠোঁট টিপে। ঠোঁট দুটি কাঁপছে ফড়িংয়ের পাখার মতো!

সান্ত্বনার ছলে বললুম—যত দুঃখ, যত যাতনাই ভোগ করো, কাঁদলে তা ঘুচবে না, বার্বারা। কেঁদোনা…ঠাণ্ডা হয়ে বলো, কি আমাকে বলতে চাও। আমার দ্বারা যতখানি সাহায্য সম্ভব হয়, সাহায্য করবো।

আমার কথা বার্বারা শুনলো নতমুখে, নির্বাক…তারপর আর একটা নিশ্বাস। বার্বারার ঠোঁট আরো বেশী-বেশী কাঁপছে…অশ্রুর বেগ বাঁধ আর মানে না বুঝি!

অনেকক্ষণ পরে স্খলিত কণ্ঠে বার্বারা বললে,—আমি জানি, আঁদ্রে আমাকে আগের মতো ভালোবাসে না! সে সুখে থাকুক ··ভগবান তাকে সব-সুখে সুখী করুন!…কিন্তু আমি…কি করে' বাঁচবো? তাকে ছেড়ে একদণ্ড আমি…রাত্রে ঘুমোতে পারি না! দু' চোখে কেবলি জল ঠেলে ঠেলে আসে। এত জলও আমার বুকে ছিল!

বার্বারার দুচোখে জল-ধারা! আমি প্রমাদ গণলুম ··কি যে করবো…

বাষ্পরুদ্ধ স্খলিত কণ্ঠে বার্বারা বলতে লাগলো—সে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে…স্বপ্নেও ভাবিনি কখনো। এই বাগানে…এইখানে…

কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। চোখের জল মুছে একটু কেসে কণ্ঠ পরিষ্কার করে বার্বারা বললে,—এইখানেই বসে আমাকে পড়ে' শুনিয়েছে পুশকিনের লেখা…এই বেঞ্চে আমার পাশে বসে!

আমার মন বিগলিত হলো…নিঃশব্দে বসে শুনতে লাগলুম তার ব্যথার কাহিনী। আমার মনে যেমন দুঃখ…আনন্দও তেমনি! বার্বারার

মুখ থেকে চোখ সরাতে পারলুম না···নিমেষের জন্য নয়। স্থির অপলক নেত্রে চেয়ে দেখতে লাগলুম···অশ্রু-ভেজা তার চোখের পাতা দুটি··· চোখের কোলে টল্‌টলে মুক্তোর ফোঁটা··স্ফুরিত কম্পিত ওষ্ঠাধর··· সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল ··

আমার মনে যা হচ্ছিল, বিশ্লেষণ করে' যদি বলি, বুঝবেন আপনারা? মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ?

এক। মনে বেদনা বোধ করছিলুম এই ভেবে যে আমাকে তুমি এমন ভালোবাসা বাসলে না কেন? যদি বাসতে, তাহলে কি আজ তুমি এমন ব্যথা পাও, বা রা?······

দুই। দরদী বন্ধু ভেবে আমাকে যে তোমার ব্যথার কথা বলছো বার্বারা, এতে আমার বুক আনন্দে ভরে' উঠেছে! আর বার্বারার কি কৃতজ্ঞতা আমার উপর···আমি তাব বেদনার কাহিনী শুনছি!

তিন। মনে মনে আমি সঙ্কল্প করছিলুম, যেমন করে' পারি, কলোশভকে আমি এনে দেবো বার্বারার কাছে। এনে বার্বারার প্রীতির নিগড়ে তাকে বেঁধে বার্বারাকে দেখাবো আমার মহত্ত্ব কতখানি!

চার। মনে হচ্ছিল, নিজের স্বার্থ ভুলে এ দুর্দ্দিনে বার্বারার মনকে যদি স্পর্শ করতে পারি, তাহলে·· তারপর···

অর্থাৎ বুঝলেন তো আমার মনে তখন কতগুলো বৃত্তির যুদ্ধ চলেছে!

কাছাকাছি কোন্ গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং করে পাঁচটা বাজলো। ঘড়ির শব্দে আমাদের হুঁশ হলো, সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই।

বার্বারা উঠে দাঁড়ালো···চারিদিকে চেয়ে আমার হাতে ভাঁজ-করা ছোট্ট একটু কাগজ গুঁজে দিলে, বললে—তাকে দেবেন।

এ-কথা বলে' সতর্ক পায়ে সে চলে গেল···যেন ঝড়ের ঝাপ্‌টা।

তার পিছনে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আশ্বাস দিয়ে বললুম—আঁদ্রেকে আমি নিয়ে আসবো···শীগগির···আর এমনভাবে···কেউ টের পাবে না। এই বাগানেই দেখা করিয়ে দেবো।

বাবারা ঢুকলো বাড়ীর দোরে···আমি বেরিয়ে পথে এলুম। ভাঁজ-করা কাগজের টুকরোটা দেখলুম। চিঠি! লেখা আছে—

আঁদ্রে নিকোলোভিচ

সমীপেষু—

পরের দিন। সকালে উঠে কলোশভের ওখানে ছুটলুম। বিশ্বাস করুন আপনারা···আমার মনে তখন স্বর্গের সুর বাজছে··· ভয়ানক মহত্ত্ব দেখাবো নিজেকে বাদ দিয়ে···যাকে ভালোবাসি, তাকে করবো সুখী! এর জন্য যদি···

কলোশভের সঙ্গে দেখা হলো। সে একা ছিল না···তার সঙ্গে দেখলুম পুজিরিন্‌কে। পুজিরিন ছিল ইউনিভারসিটির ছাত্র···ডিগ্রী পাশ করতে পারেনি। তা না পারুক, নামজাদা ঔপন্যাসিক বনেছে। তার "মস্কো" নভেলখানা নাকি দস্তুরমতো রোমাঞ্চকর। পুজিরিন মানুষ ভালো···একটু লাজুক-স্বভাবের। বয়স তেত্রিশ হলেও তার ছেলেমানুষির সীমা নেই। এক ধরণের মানুষ আছে না, সব কথা সব আলোচনার মধ্যে কবিদের লেখা ছত্র মিশিয়ে 'কাব্যিক' সাজতে চায়? পুজিরিন হলো সেই ধরণের মানুষ। নিজের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা তুলে আক্ষেপ করে' সে কবিতা আওড়াতো···

বঙীন কুসুম—গন্ধ অতুল যার—
প্রখর-রৌদ্রে সব-আগে মরে যায় !
যার মন ধায় উর্দ্ধে আকাশ পানে,
মরণ তারেই অকালে লইতে চায়।

মুখে পাইপ···চোখের উদাস দৃষ্টি উর্দ্ধ-আকাশে···থেকে-থেকে কবিতা আওড়ানো···এগুলোকে পুঞ্জিরিন আশ্চর্য্য-রকম মজ্জাগত করেছে। তার এই ভুয়ো-কাব্যি-ভাব দেখে আমাদের হাসি চাপা দায় হয়—তা এরা বোঝে না।

পুঞ্জিরিন তার নতুন-লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিল কলোশভকে। আমি গিয়ে নিঃশব্দে কাছে বসলুম···কাজেই সে-কবিতা না শুনে উপায় ছিল না।

কবিতায় কাহিনী লিখেছে পুঞ্জিরিন,—নায়িকাকে ভয়ানক ভালোবাসতো তার কবিতার নায়ক···তার পর নায়িকাকে একদিন মন থেকে নিঃশেষে ঝেড়ে ফেললো নায়ক···এই ব্যাপার। আর এই ব্যাপার নিয়ে প্রকাণ্ড এক কবিতা। যেমন বিশ্রী লেখা, তেমনি বিশ্রী তার পড়ার ভঙ্গী। আসলে পুঞ্জিরিনের কণ্ঠ কর্কশ···তার উপর দুলে দুলে এমন ঢং করে' পড়ে যে বসে' শোনা গলদঘর্ম্ম কাণ্ড !

কলোশভ শুনছিল···চোরটির মতো বসে···যেন দৈত্যের কবলে সে বন্দী···নিতান্ত নিরুপায়—এমনি ভাব !

কবিতা শেষ হলে কলোশভ বেশ খানিকটা শ্লেষ-ভরা মন্তব্য করলে···তবু পুঞ্জিরিন তাকে ছাড়ে না ! কলোশভ যত পাশ কাটাতে চায়, পুঞ্জিরিন তাকে তত তেড়ে তেড়ে ধরে।

বেচারীর মতো কলোশভের তাকালো আমার পানে···আমি দিলুম সেই ফাঁকে কলোশভের হাতে গুঁজে বার্বারার লেখা ছোট্ট চিঠিখানা।

ভাঁজ খুলে চিঠি পড়তে লাগলো কলোশভ। আমি রইলুম নিঃশব্দে বসে।

চিঠি পড়া শেষ করে' কলোশভ আবার তাকালো আমার পানে। মুখে হাসির রেখা···বললে,—ও, তুমি তাহাকে সেমিনোভিচের ওখানে গিয়েছিলে!

—হুঁ। বললুম,—কাল গিয়েছিলুম···একলা।

কলোশভ বললে—বটে! কথায় শ্লেষের আমেজ! কলোশভ পাইপ ধরালো।

আমি বললুম—মনে একটুও ব্যথা বাজে না আঁদ্রে? তার পানে একবার যদি চেয়ে ত্থাখো···বেচারী! চোখে জল···কি মলিন মূর্ত্তি!

সব কথাই কলোশভকে বললুম। বাবারার বেদনা-ব্যথায় আমি সত্যই খুব অভিভূত হয়েছিলুম।

কলোশভ কিন্তু একটি কথাও বললে না···নিঃশব্দে বসে পাইপ টানতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে···

নিশ্বাস ফেলে কলোশভ বললে,—হুঁ···বেশ গাঢ় গম্ভীর কণ্ঠ!

কলোশভ বললে—সেই আপেল-গাছের নীচে যে-বেঞ্চ, সেই বেঞ্চেই তুমি বসেছিলে!···আমার মনে আছে···তখন মে-মাস···আমিও ওখানে ঐ বেঞ্চে তার সঙ্গে বসতুম।···বার্বারার একখানি হাত আমার হাতে · খুব আনন্দ পেতুম! আপেলের সে বোউল আর আজ নেই—আপেলও লাগে টক্!

রাগে আগুন হলুম। বেশ ঝেঁজে আঁদ্রেকে ভর্ৎসনা করলুম, তার এই নিষ্ঠুর ঔদাস্য, নীচ অবহেলা আর ইতর ব্যবহারের জন্ম! তর্ক

তুললুম,···নিরীহ সরল এক কিশোরীর মনকে ভাবাবেগে আকুল করে' এভাবে তাকে বর্জ্জন···অমানুষিক···দারুণ অপৌরুষ!

অনেক কথা বললুম···সে-সব কথার শেষে মিনতি জানালুম···কাতর মিনতি···বললুম,—বার্বারার সঙ্গে দেখা করবে, চলো ভাই···

আমার ভর্ৎসনা, আমার যুক্তি, আমার মিনতি···কলোশভ সবই শুনলো···নিঃশব্দে···বেশ একাগ্র-মনে।

এতগুলো কথা বলে···তর্ক করে' মিনতি জানিয়ে ক্লান্তি বোধ করলুম। ক্লান্তি-ভরে আর্মচেয়ারে হেলে বসলুম।

কলোশভ তখন বেশ শান্ত সহজভাবে বললে—তুমি যা-যা বললে, তার সব আমি মেনে নিচ্ছি···অর্থাৎ তুমি আমার পরম-বন্ধু···আমার আচরণের ত্রুটি ধরবার, সমালোচনা করবার অধিকার তোমার আছে! ···কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কি বলবার আছে, তা শোনবার আগে···

এই পর্য্যন্ত বলে' আমার পানে চেয়ে কলোশভ হাসলো···হেসে তেমনি শান্ত সহজ স্বরে বললে,—বার্বারা মেয়েটি খুবই ভালো···মন বেশ উঁচু···সরল···আমার কোনো অনিষ্ট বা ক্ষতি সে করেনি···বরং উল্টে তার কাছে আমার যে ঋণ, তা শোধ হবার নয়!···তবু তার ওখানে যে আর যাই না···ঔদাস্য দেখিয়ে তার সঙ্গ যে ত্যাগ করেছি, তার কারণ···

বাধা দিয়ে বললুম—পারো যদি আমাকে তা বুঝিয়ে বলতে—কেন তুমি এমন করছো···

—কেন করছি, জানেন শুধু আমার অন্তর্যামী! তাকে যতদিন ভালো বেসেছি, একান্তভাবে তারি ছিলুম। তাকে ছেড়ে আমার ভবিষ্যৎ···কখনো কল্পনা করিনি। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তার জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে জড়িয়ে এক করেই দেখেছি! এখন মনের সে-ভাব আর

নেই।···তুমি হয়তো বলবে, একে ভালোবাসা বলে না—ভালোবাসার নাম করে মিথ্যা খেলা···ভাণ···এবং এ ভাণ আর মিথ্যা খেলা হলো চরম কাপুরুষতা···এই তো? আর তুমি এ কথা বলবে তার কারণ, তার উপর তোমার মমতা হয়েছে···মনে দরদ হয়েছে···কিন্তু তার যদি এতটুকু সম্মান-বোধ থাকতো, তাহলে সে কখনো তোমার কাছে এমন দীন ভিক্ষুকের মতো প্রার্থনা জানাতো?···আমার সে-ভালোবাসায়···সে মমতায় বাবারা যখন মনে কোনো সান্ত্বনা পায় না, তখন কি করে' বলবো, সে খুব সরল···ভালো···?

কলোশভের এই বর্বর হৃদয়হীন ইঙ্গিতে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো! বিশেষ তার ঐ কথা···আমি যাকে প্রাণের চেয়ে ভালো বাসি, মনে-জ্ঞানে যাকে আমি পূজা করি, তাকে উদ্দেশ করে'! বেশ কঠিন রূঢ় কণ্ঠে আমি বললুম—থামো···তোমার ওস্তাদী সেন্টিমেণ্ট আর কাব্যি রেখে দাও।···আসল কারণ আমি জানি, কেন তুমি ওখানে যাওয়া বন্ধ করেছো।

—কি তুমি জানো? শুনি···কলোশভের কণ্ঠ শান্ত।

—তানিশা তোমাকে যেতে বারণ করেছে···তাই তুমি যাওয়া বন্ধ করেছো।

কথাগুলো মুখ থেকে বেরুবা মাত্র আমার মনে হলো, কলোশভের বুকে তীর ছুড়লুম! তানিশা ভয়ানক হাল-ফ্যাশানের মেয়ে···শ্যামাঙ্গী··· মাথায় ঘন কালো চুল···বয়স হবে চব্বিশ-পঁচিশ বছর···ভয়ঙ্কর চতুর··· যাকে বলে, স্বাধীন-জেনানা···শিটভের নারী-সংস্করণ! কলোশভের সঙ্গে তার মানের পালা লেগেই আছে। মাসের মধ্যে পনেরো দিন ভয়ানক বিরোধ···মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। কলোশভের মুখের উপরেই তানিশা কতদিন অমন বলেছে—তোমার রক্ত দর্শন

করলে তবে আমার রাগ যায়!···অথচ···তানিশাকে না হলে আঁদ্রের চলে না! তানিশা এখন তার সর্ব্বস্ব!···তানিশার ও-সব অপমান কলোশভ গায়ে মাখে না।

আমার কথা শুনে কলোশভ আমার পানে তাকালো···নির্বাক··· খানিক পরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—হয়তো তাই!

—হয়তো! আমি তেড়ে হুঙ্কার তুললুম, বললুম—হয়তো নয়··· মনের সঙ্গে ছলনা মিথ্যা···আঁদ্রে! আমি বলছি, হয়তো নয়, তাই হলো কারণ···আসল কারণ।

আমার কথায় কলোশভের ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। সে উঠে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে টুপি হাতে নিলে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় যাচ্ছো?

—একটু বেড়িয়ে আসি। আগে পুস্কিরিন, তার পর তুমি···দুজনের চাপে মাথাটা বেশ ধরে উঠেছে!

নিজেকে সম্বরণ করলুম, সহজ কণ্ঠে বললুম—আমার উপর রাগ করলে?

—না, রাগ করবো কেন? মৃদু হেসে কলোশভ আমার একখানা হাত চেপে ধরলো।

আমি বললুম—একটা কথা, শুধু সেখানে না যাও···বার্বারাকে কোনো কথা বলবার নেই? সে যে-চিঠি লিখেছে, সে-চিঠির জবাবে··· একটা লাইন অন্ততঃ?

—হুঁ! বলে সে চুপ করে কি ভাবলো। প্রায় দু-তিন মিনিট। তার পর বললে—তুমি বললে না, বার্বারা তোমাকে বলেছে, আমি পাশে বসে বার্বারাকে একদিন পুশকিনের লেখা কবিতা পড়ে শুনিয়েছি?··· তাকে মনে করিয়ে দিয়ো যে কবিতা শুনিয়েছিলুম, তার সেই লাইনটা···

—কোন্ লাইন ?…

গম্ভীর কণ্ঠে কলোশভ বললে,—এইটে…

বলে আবৃত্তি করলে,—

হয়ে না গেছে হায়,
হবে না পুনরায় !

এ কথা বলে কলোশভ আর একদণ্ড দাঁড়ালো না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছুটলুম তার পিছনে।

সিঁড়ির দরজায় কলোশভ একবার দাঁড়ালো, জিজ্ঞাসা করলে… টুপিটাকে চোখের সামনে তুলে নিজেকে আড়াল করে'—তাকে কি খুব বেশী-রকম কাতর দেখলে ?

—নিশ্চয়। খুব বেশী রকম কাতর।

—বেচারী !…তাকে তুমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করো ভাই…তাকে তুমি ভালো বাসো যখন…

—হুঁ…আমার সাধ্যমত তাকে বুঝোতে হবে…তার উপর আমার মমতা খুবই…

—শুধু মমতা ?…আমি জানি, তুমি তাকে ভালোবাসো…কথাটা কলোশভ বললে সোজা আমার পানে চেয়ে…বললে—গোপন করবার কারণ নেই…তুমি তাকে ভালোবাসো…খুব বেশী রকম ভালোবাসো। কথাটা বলেই সে ফিরলো…

এবং সেইখানে এমনিভাবে আমাদের বিচ্ছেদ…

বাড়ী ফিরলুম। মাথা ভয়ানক দপ্ দপ্ করছে। দেহ আগুন… যেন খুব জ্বর ! গায়ে তেমনি জ্বালা !

বিছানায় পড়ে ভাবতে লাগলুম…আকাশ-পাতাল কত চিন্তা !

ভাবলুম, আমার কর্তব্য আমি করেছি···নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে·· নিজেকে পায়ে চেপে মাড়িয়ে থেঁতো করে' ফেলেছি···বার্বারার কাছে আঁদ্রেকে একটিবারের জন্ত অন্ততঃ যেতে বলেছি! এর বেশী আমি কি করতে পারি? যা করবার, তা সম্পূর্ণ করেছি! ও যদি এমন অমানুষের মতো···

আঁদ্রের এ ঔদাস্থ মর্ম্মান্তিক বেজেছে আমার। আমাকে বললে, আমি যেন বার্বারাকে ভালো করে সব বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি! এতকাল ধরে' খেয়ালী-খেলায় নিরীহ বেচারীকে প্রমত্ত করে'···সরে পড়েছো··· এখন তোমার এ-নোংরামি আমি সাফ করবো! বটে! তোমার নিজের কোনো কর্ত্তব্য নেই?

কথাগুলোয় কিন্তু আমার উপর হিংসার বাষ্পয়াভাস নেই! তবু··· বার্বারা কি এমনি সাধারণ-মনের আর পাঁচটা মেয়ের মতো! তোমার মমতা বা দরদ···কিছু পাবার যোগ্য নয় সে? আঁদ্রে, তাকে ভালো না বাসো, একটু করুণাও করবে না?···

কিন্তু এ-সব চিন্তা নিষ্ফল!···বার্বারা আমাকে ভালোবাসে না··· এতটুকু নয়···আঁদ্রের সম্বন্ধে সব আশা বিসর্জ্জন দিলেও···

তবু··এর পর? চির-ভক্তের আকুল হৃদয়-নিবেদন?···আমার কোনো দাবী নেই! দাবার কথা তুলছি না···নিজেকে আমি উৎসর্গ করতে চাই বার্বারার হাতে।···

বার্বারা···বার্বারা···কখনও তা সম্ভব হবে না? আমাকে কখনো তুমি ভালোবাসতে পারবে না? কখনো···কখনো না?

আপনারা বুঝচেন, ১৮৩৩ সালে মস্কো সহরে আমার পরমপূজ্য শিক্ষা-গুরুর গৃহে নায়কের ভূমিকায় রিহার্শাল দিচ্ছি···চোখে আমার অশ্রুর বন্যা···দেহ মূর্চ্ছাতুর!···বাহিরে তখন প্রচণ্ড দুর্য্যোগ নেমেছে। যেমন

জল, তেমনি ঝড়! বাহিরের ঝড়ের দৌরাত্ম্যে গাছপালার বুকে কি হাহাকার! বদ্ধ শাসির গায়ে ঝড়ের কি দুরন্ত আস্ফালন! আকাশে ঘন-কালো মেঘের সঙ্গে বিদ্যুৎবহ্নির চমক-লাগানো সংগ্রাম!

উঠে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে কাকেও কিছু না বলে' আমি বেরিয়ে পড়লুম...পথ থেকে একখানা গাড়ী ভাড়া করে' সেই গাড়ীতে ..

গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালো সহরের প্রান্তে সেমিনোভিচের বাড়ীর দোরে। দুর্য্যোগ চলেছে সমানে...সারা পৃথিবী জুড়ে যেন...

গাড়ী থেকে নেমে মনে হলো, বার্বারাকে বলবো, এ-কথা আঁদ্রেব চরম বিদায়-বাণী? না, মিথ্যা কোনো কাহিনী বলে ছলনায় তাকে ভোলাবো? দেখা যাক, আঁদ্রের অদর্শনে, ঔদাস্যে তাকে ছেড়ে বার্বারার মন ধীরে ধীরে আমার উপর কোনোদিন যদি প্রসন্ন উন্মুখ হয়!

কিছু ঠিক করতে পারলুম না এবং মনে এই দ্বিধা আর সংশয় নিয়ে ঢুকলুম গিয়ে সেমিনোভিচের ড্রয়িং-রুমে।

ঘরে বসে আছে সেমিনোভিচের সঙ্গে বোন মেট্রোনা আব মেয়ে বাবারা। আমাকে দেখে বার্বারার মুখ চকিতে হলো কাগজের মতো সাদা...স্পষ্ট তা লক্ষ্য করলুম।...গুম্ হযে সে বসে রইলো...আসন ছেড়ে উঠলো না!

সিদোরেঙ্কো মেতে উঠলো তার রং-তামাসার পশরা খুলে...বিদ্রূপের নানা প্রশ্ন!

মৃদু হেসে দু-এক কথার তাকে ছোট্ট জবাব দিয়ে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিচ্ছিলুম আর মাঝে মাঝে সকলের অলক্ষ্যে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম বাবারার পানে। সে কাঠ হযে বসে · সমানে! তার প্রাণ-মন কিছুই যেন নেই!

লেফটেনাণ্ট বললে,—দু' এক দান হুইষ্ট খেলা যাক্, এসো। তাসের চেহারা একদম্ ভুলে গেছি—না খেলে-খেলে।

খেলায় বসতে হলো। বার্বারা উঠে জানলার ধারে গেল··· সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো···নির্বাক, নিস্পন্দ!

খেলতে-খেলতে সেমিনোভিচ বার-বার একই প্রশ্ন নিক্ষেপ করছে বার্বারাকে উদ্দেশ করে'—তোর শরীরটা আজ ভালো নেই, বুঝি?··· শুধু প্রশ্নই করলো···উত্তরের জন্ত এতটুকু তার মাথা-ব্যথা দেখলুম না যেমন, বার্বারাও তেমনি না দিলে বাপের সে-প্রশ্নের জবাব···না, একবার তাকালো বাপের দিকে ফিরে!

অনেকক্ষণ পরে সুযোগ মিললো···ক'দান খেলার পর সেমিনোভিচ উঠে পাশের ঘরে গেল; বললে—আধ ঘণ্টাটাক দেরী হবে···পালিয়োনা মোদ্দা ছোকরা!

মেট্রোনা এ-ঘর থেকে আগেই কখন্ চলে গেছে···এ-ঘরে বার্বারা আর আমি।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে পা-টিপে নিঃশব্দে বার্বারা এলো আমার কাছে···এবং খুব চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলে,—আপনি একলা এলেন?

—হুঁ! বললুম—এবং এখন থেকে একলাই আসবো, বোধ হয়।

বার্বারার মুখ হলো মলিন, দৃষ্টি করুণ। একটা নিশ্বাস ফেললো, তারপর তেমনি চাপা গলাতে প্রশ্ন করলে,—আমার চিঠিখানা···?

তার কথা শেষ হলো না। জবাব দিলুম—সে-চিঠি তাকে দিয়েছি।

—তাহলে···? বার্বারার সে কী দৃষ্টি···তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো!···তার পানে আমি চেয়ে রইলুম···অপলক দৃষ্টি···

হঠাৎ বিদ্বেষের জ্বালা···আমার মনে অভিসন্ধি জাগলো। বললুম—তোমাকে বলতে বলেছে—পুশকিনের কবিতায় যে-কথা পড়েছো···

হয়ে যা' গেছে হায়
হবে না পুনরায়···

আঁদ্রে চিঠির জবাব দিলে না; বললে, পুশকিনের এই লাইন তার জবাব।

বাবারার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো···বাঁ হাতে বুকখানা চেপে ডান হাত দিয়ে সে দেওয়াল ধরলো···তারপর টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি যাচ্ছিলুম তার পিছনে · যাওয়া হলো না—সেমিনোভিচ্ ঘরে ঢুকলো···যেন আকাশ থেকে পড়লো সে!

তারপর আরো দু'ঘণ্টা বসতে হলো সেমিনোভিচের সঙ্গে। প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছিল, বাবারা আসবে, চোখে তাকে দেখবো···কিন্তু বাবারা আর এলো না·· নিমেষের জন্য নয়!

পথে বেরিয়ে লজ্জায় অভিভূত হলুম। বাবারার কাছে···আঁদ্রের কাছে এর পর কোন্ মুখে···

নিজেকে বার-বার ধিক্কার দিলুম। ছি···ছি···ছি···

অনেকে বলেন, অঙ্গে দুষ্ট ব্যাধি হলে বাঁচবার জন্য সে-অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়াই উচিত। কিন্তু মন আমাকে বারে-বারে বলতে লাগলো—বেচারী! বেচারী বাবারা···তাকে এত-বড় আঘাত দিলে তুমি কোন্ অধিকারে? কিসের অধিকারে? সে তোমার কে···কি-ই-বা করেছে ক্ষতি তোমার···

সে-রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারিনি···মনে নানা ভাবনা! শেষ রাত্রে ক্লান্তিবশে একটু বুঝি ঘুম···আপনাদের আগেই বলেছি, প্রেমের দায়ে ঘুম বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার মতো দুর্দ্দশা আমার কস্মিন্‌কালে ঘটেনি!

এর পর থেকে প্রায় যেতুম সেমিনোভিচের ওখানে। কলোশভের সঙ্গে দেখা-শুনা হয়···কিন্তু বার্বারার নাম আর তুলিনি কোনোদিন তার কাছে।···

বার্বারার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দাঁড়ালো বেশ একটু অদ্ভুত-রকমের। আমি গেলে বার্বারা খুশী হয়···একদণ্ড আমার কাছ থেকে সরে থাকতে চায় না···তবে সে-সান্নিধ্যে না থাকে ভালোবাসার এতটুকু নামগন্ধ, বা সম্ভাবনা! আমার দরদ, আমার মমতা সে বোঝে···আমার সঙ্গে কথা যা কয়···বেশ একাগ্র-মনে! কি কথা, জানেন? কেবল কলোশভের কথা···কলোশভের কথা ছাড়া আর কোনো কথা সে জানে না, মনে হয়!···এমন ভূতের মতো কলোশভ তাকে পেয়ে বসেছে যে বার্বারা নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে কলোশভের মধ্যে! ···তার মর্য্যাদাবোধ, সম্মান-জ্ঞান জাগিয়ে তুলতে অনেক চেষ্টা করেছি··· আমার কথা সে শোনে চুপ করে···সে কথার জবাব দেয় না! নিজে যদি কথা কয় তো শুধু কলোশভের কথা!···

নীরব ব্যথার চেয়ে এই মুখর বেদনাভোগ—এ কত করুণ, জীবনে এ কত বড় ট্রাজেডি··বার্বারার কথায়-বার্ত্তায়, হাবে-ভাবে আমি তা প্রথম বুঝেছি।···থেকে থেকে আমার অসহ্য বোধ হতো।···বুঝেছিলুম, বার্বারার বুকে কলোশভের যে-আসন শূন্য

হয়েছে, সে আসনের কোণেও আমি কখনো স্থান পাবো না—প্রাণ-ভরা ভালোবাসা উজাড় করে দিলে নয়…নিজেকে চূর্ণ করে বলি দিলেও নয়! কলোশভের কথা বার্বারা বলে…শুনতে শুনতে আমি বুঝি, বার্বারার অতীতটুকু কতখানি ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ…কী পরিপূর্ণ তার সঞ্চয়…আর বর্ত্তমান কী ভযানক-রকমে নিঃস্ব রিক্ত! পুশকিনের লেখা সেই ছত্র আমার মনে সব-সময় জেগে আছে…হয়ে যা গেছে হায়, হবে না পুনরায়!…

বার্বারার কথায়-বার্ত্তায় চলায়-ফেরায় এই কথারই ইঙ্গিত পাই…আঘাতের সে-বেদনায় দু-চারদিন শুধু তাকে মলিন দেখেছি, কাতর দেখেছি! তারপর সে-মালিন্য কাটিয়ে আবার সে চলেছে তার দীপ্ত-ললিত ছন্দে! হাসি-খুশীও ফুটেছে মনে-মুখে।

তাকে দেখে আমার কি মনে হতো, জানেন? মনে হতো, ঝড়ের ঝাপটায় ব্যথায় আর্ত্ত-আতুর হয়ে পাখী পড়েছিল দু'দিন…এখনো সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি!

শেষে আমার অবস্থা দুর্বহ দুঃসহ হয়ে উঠলো! হিংসা-বিষে মন দিনে-দিনে পরিপূর্ণ হচ্ছে…বার্বারার সামনে কলোশভকে অমানুষ নির্ষ্ঠুর বলে প্রমাণ করতে লাগলুম—কলোশভের উপর বার্বারার মনে জাগুক ঘৃণা, বিরাগ—এই হলো আমার লক্ষ্য।…এমনিভাবে কখনো যদি বার্বারার মনকে আমার দিকে ফেরাতে পারি…

আমার ভবিষ্যতের সঙ্গে বার্বারা এমন বিজড়িত হচ্ছিল যে তাকে ছেড়ে আমার ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো! দুনিয়া শূন্য মনে হতো! বার্বারার কাছ থেকে সরে থাকা শেষে অসম্ভব মনে হলো। ভাবলুম, বলবো প্রকাশ করে' আমার মনের কামনা? বলবো, বার্বারা, তোমাকে আমি ভালোবাসি…এত

ভালোবাসি যে দুনিয়ার সব, দুনিয়ায় সকলকে আমি ত্যাগ করতে পারি তোমার জন্য...তুমি আমার সর্ব্বস্ব ?

প্রকাশ করে' বলবার সাহস কিন্তু হলো না। বললে তাকে পাবো, কোথায় সে আশা ?...যদি বার্বারাকে বিবাহ করি ?

বিবাহের কথা মনে জাগবামাত্র শিউরে উঠলুম। আমার বয়স তখন আঠারো বছর...এ বয়সে জীবনকে শৃঙ্খলে জড়িত করবো ? বাবার কথা মনে হলো ! কলোশভের বন্ধুদের কর্কশ শ্লেষের হাসি যেন কানে বাজলো বিকট রবে !

প্রেমার্ত্তের কল্পনা...ভয়ে আর সংশয়ে চিরদিন কল্পনাই থেকে যায়। কদিন শুধু বিবাহের স্বপ্ন দেখলুম ! কল্প-নয়নে দেখলুম, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ বার্বারার অন্তর ! কলোশভের পরম-বন্ধু আমি।...কলোশভের সঙ্গে তার মনের নিগূঢ় সম্পর্ক ভালো করে জেনেও তাকে পত্নীর সম্মানে ভূষিত করছি বলে' ! জীবনে যাঁদের প্রখর অভিজ্ঞতা প্রচুর, তাঁদের অনেকের কাছে শুনেছি, প্রেমের দায়ে বিবাহ—সে শুধু আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন !...সে শুধু নভেলে-নাটকে সম্ভব !...

কত কি কল্পনা করতুম ! মনে মনে ছবি আঁকতুম, আমাদের বিবাহ হয়েছে...বার্বারাকে নিয়ে দক্ষিণ-রাশিয়ায়...বিজনে রচনা করেছি আরাম-নীড় ! মানস-নেত্রে ছবি দেখতুম...বার্বারার মন আমাকে গ্রহণ করে' ধীরে ধীরে আমাময় হয়ে উঠেছে !...

বুকখানা কেমন করে' উঠতো ! মনে হতো, বাতাসে এ কি প্রাসাদ তৈরী করছি ! মিথ্যা...মিথ্যা...মরীচিকা ! তার চেয়ে পালিয়ে যাই মস্কো ছেড়ে...ইউনিভার্সিটি ছেড়ে...এখানকার সঙ্গে সব বন্ধন কেটে, এখানকার সব কিছু ভুলতে ! তা যদি পারি...

কলোশভের সঙ্গে দেখাশুনা শেষে বন্ধ করলুম।

একদিন শীতকাল ··সকাল-বেলা আকাশে মেঘ নেই, কুযাশা নেই···সূর্য্যের তেজ বেশ দীপ্ত প্রখর···ভালো পোষাকে সেজে গুজে সেমিনোভিচের বাড়ী গিয়ে উদয় হলুম। ঢুকলুম গিয়ে ড্রয়িং-রুমে ·· আগের দিন সন্ধ্যার সময বার্বারার মোহিনী-মূর্ত্তি দেখে এসেছিলুম। ড্রয়িং-রুমে বসে বার্বারা একখানা বই পড়ছে···কারামজিনের লেখা বই।

আমাকে দেখে নিঃশব্দে বইখানা বন্ধ করে' সে কোলের উপর রাখলো···রেখে আমার পানে চাইলো···চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড আগ্রহ। ·· এর আগে এ বাড়ীতে আমি সকালে কখনো আসিনি।··

বার্বারার পাশে একখানা চেযারে আমি বসলুম। বুকের মধ্যে ভযের একটু কাঁপন···মনে হচ্ছিল, বুকে যেন পাথব চাপানো!

অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম—কি পড়ছো? কাব লেখা?

—কারামজিন।

—রাশিয়ান লেখক! তুমি রাশিযান্ বই পড়তে ভালোবাসো?

সে-কথার জবাব না দিয়ে বার্বারা একেবারে প্রশ্ন করলে,—তুমি কি আঁদ্রের কাছ থেকে আসছো? তার কথায?

রাগে জ্বলে উঠলুম। এত তাচ্ছল্য ··এতখানি হেযজ্ঞান করো আমাকে! ···ঐ নাম···কম্পিত স্খলিত কণ্ঠে ঐ প্রশ্ন! এর চেযে ভালোবাসার বড় প্রমাণ আব আছে? প্রশ্নটা আমার বুকে বিঁধলো তীক্ষ্ণ তীরের মতো!

তখনি ঠিক করলুম, বার্বারার কাছ থেকে চির-বিদায নেবো, না হয, বার্বারার মন আর কণ্ঠ থেকে আঁদ্রের নাম জন্মের মতো উপড়ে ছিঁড়ে ফেলবো!

তারপর বার্বারাকে কি যে বলেছি, তার কিছু মনে নেই। প্রথমটা অস্পষ্ট কি কতকগুলো যেন বলেছিলুম···হেঁযালির মতো ··বার্বারা

তার মর্ম্ম বুঝতে পারেনি···প্রশ্ন-ভরা আকুল দৃষ্টিতে সে আমার পানে তাকিয়েছিল! সে-দৃষ্টিতে আমি বিহ্বল বিবশ হয়ে নিজেকে সম্বরণ করতে পারিনি···বাবারাকে বলেছিলুম—আমি ভালোবাসি···তোমায় ভালোবাসি বাবারা···আমি তোমাকে বিবাহ করবো!

এ-কথায় বার্বারার চোখ···সে যেন পুতুলের চিত্রকরা চোখ! সে কেমন হতভম্বের মতো চেয়েছিল···চকিতের জন্য···তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে,—আমাকে তুমি ভালোবাসো!

আর কোনো কথা নয়! আবেগ নয়···উচ্ছ্বাস নয়···কিছু নয়! মনে হলো, সে যেন এখনি এ-ঘর থেকে চলে যাবে···স্খলিত মৃদু কণ্ঠে আমি বললুম—না, না, এখনি আমি তোমার জবাব শুনতে চাই না··· এখনি নয়। বেশ করে' তুমি ভাবো···ভেবে আমায় জবাব দিয়ো···কাল আমি আসবো···কাল তুমি আমাকে বলো তোমার জবাব। আজ নয়···আজ কিছু বলতে হবে না!···জানো, আমি তোমাকে কতদিন থেকে ভালোবাসি···যেদিন প্রথম তোমাকে দেখি।···আমি চাই না—জোর করে' তোমার ভালোবাসা আদায় করতে। আমাকে ভালোবাসতে না পারো, দয়া করে' আমাকে বন্ধু বলে' সাথী বলে' সহায় বলে' যদি গ্রহণ করো!···না, না, আজ তোমাকে কোনো কথার জবাব দিতে হবে না! কাল আমি আসবো···কাল আমাকে বলো···

এ-কথা বলে' আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে রইলুম না···পাগলের মতো সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

ঘরের বাহিরে প্যাশেজে সেমিনোভিচের সঙ্গে দেখা।

আমাকে দেখে সেমিনোভিচ একটুও আশ্চর্য্য হলো না···মুখে

খুশীর হাসি···আমাকে একটা আপেল দিলে।···তার সৌজন্যে আমি বিস্ময়ে নির্বাক!

সেমিনোভিচ বললে,—বাড়ীতে গিয়ে খেয়ো···চমৎকার আপেল হে···যেমন মিষ্টি, তেমনি রসালো।

নিলুম তার আপেল। দাঁড়ালুম না···তখনি চলে এলুম। এলুম নিজের বাসায়!

আপনারা বুঝতে পারছেন, সেদিনটা আর তার পরের দিন সকালটা আমার কি ভাবে কাটলো! সেদিন রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। সারা রাত শুধু এক চিন্তা···কায়-মনে ভগবানকে ডেকেছি—সত্যি, বিশ্বাস করুন! ভগবানকে ডেকে বলেছি, ঠাকুর···আমার উপর ওকে প্রসন্ন করো।···ও 'না' বললে আমি বাঁচবো না···মরে যাবো। আমি জানি, ও আমাকে ভালোবাসবে না···বাসবে না! হায় রে, কেন হঠাৎ এখনি ওকে এ-কথা বললুম···দুদিন যদি সবুর করতুম! দুদিন···না হয় দুমাস, না হয় দুবছর! তা করলে দেখার সুখ, দেখার আশাটুকুও নির্ম্মূল হতো না!···

এমনি চিন্তার তরঙ্গে মন বিপর্য্যস্ত।

অস্থির হয়ে বাবাকে চিঠি লিখতে বসলুম···মরিয়া হয়ে হতাশ-প্রাণের যত খেদ যত আক্ষেপ জানিয়ে···

চিঠিতে নিজের সম্বন্ধে 'আমি' কথাটা না লিখে বরাবর লিখলুম—আপনার পুত্র!···

চিঠি লিখে প্রায় শেষ করেছি, বন্ধু বোবোভ এলো দেখা করতে··· তার কাঁধে মাথা রেখে চোখের জলে নিজেকে ডুবিয়ে দিলুম। সে একেবারে হতভম্ব!··

পরে জানলুম, সে এসেছে আমার কাছে কটা টাকা ধার চাইতে··· টাকা না পেলে বাড়ীওয়ালা তাকে তাড়িয়ে দেবে, ভয় দেখিয়েছে। টাকা-পয়সা, বন্ধু-বান্ধব-দুনিয়া···কিছু আমার ভালো লাগছিল না। তাকে বললুম—মাপ করো···টাকাকড়ি আমার নেই···দিতে পারবো না।

মলিন মুখে বেচারী চলে গেল।

পরের দিন···চরম-মুহূর্ত্ত উদয় হলো···ঘর থেকে বেরুলুম। দ্বারে দাঁড়িয়ে···নিথর নিস্পন্দ। মনে হলো, এ-ঘরে আবার যখন ফিরে আসবো, হয়তো তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব, নিঃসম্বল! না···

পৌছুলুম গিয়ে অবশেষে সেমিভোনিচের বাড়ী।

বাড়ীর সামনে পৌছুবামাত্র মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো···দেহে-মনে ভয়ানক ক্লান্তি আর অবসাদ।

গাড়ী থেকে নেমে কতকগুলো কুচো বরফ কুড়িয়ে মুখে বেশ করে ঘষলুম। মনে হলো, যদি দেখি বার্বারা একা আছে···বুকে যেন বাজ পড়বে!

পা দুখানা অবশ···চলতে চায় না! সিঁড়ি দিয়ে উঠবো, পা বিষম ভারী। যে-করে' পা দুখানাকে টানতে টানতে দোতলায় উঠলুম, বলবার নয়!

উঠে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম।···বার্বারা একা নয়! সঙ্গে মেট্রোনা··· দুজনে বসে আছে ড্রয়িং-রুমে। দুজনকে অভিবাদন জানিয়ে বসলুম মেট্রোনার পাশে। বার্বারার পানে চকিত-দৃষ্টিতে চাইলুম।

তার মুখ যেন আরো বিবর্ণ মনে হলো···তার দৃষ্টি অন্য দিকে। বুঝলুম, আমার পানে তাকাবে না!

হঠাৎ কোনো কথা নেই, মেট্রোনা উঠলো। উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।···

জানলা দিয়ে আমি বাহিরে আকাশের পানে তাকিয়ে···বুক কাঁপছে···বাতাসের দোলায় গাছের পাতা যেমন কাঁপে, তেমনি! বার্বারা মৌন মূক···

আমিই শেষে ··

কোনোমতে বার্বারার কাছে গেলুম। নতশিরে কম্পিত মৃদু-কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম—আমার প্রার্থনার উত্তর···

বার্বারা মুখ ফেরালো···বড় একটা নিশ্বাস ফেললো···তার চোখের কোলে জল টল্‌টল্ করছে!

উদ্যত নিশ্বাস চেপে আমি বললুম,—থাক্···বুঝেছি আমার আশা··· দুরাশা!

বার্বারা আমার পানে তাকালো···সলজ্জ ভঙ্গী···একখানি হাত প্রসারিত করে' দিলে আমার দিকে···মুখে কথা নেই।

আমি ডাকলুম,—বার্বারা···

কে যেন কণ্ঠ চেপে ধরলো। দারুণ নৈরাশ্যে···ভয়ে···কি বলবো, ভুলে গেলুম।

দুজনের কারো মুখে কথা নেই·· অনেকক্ষণ।

পরে মাথা নীচু করে' বার্বারা বললে···অত্যন্ত সলজ্জ মৃদু কণ্ঠ— বাবার সঙ্গে কথা কবেন।

বুকখানা একটু দুলে উঠলো। বললুম—তোমার অনুমতি আছে?

—হুঁ।···বার্বারার হাত দুখানা চেপে ধরে আবেগে আমি চুম্বনে অভিষিক্ত করলুম।

—আঃ! বলে' বার্বারা হাত ছাড়িয়ে নিলে আমার হাতের বাঁধন থেকে। তার চোখ থেকে টশ্‌টশ্ করে' দু' ফোঁটা জল ঝরে পড়লো।

তার পাশে আমি বসলুম···তাকে আশ্বাস দিলুম···সান্ত্বনা দিলুম···বোঝালুম। তার চোখের জল দিলুম মুছিয়ে।

পরম সৌভাগ্য, সেমিয়োনিচ্ বাড়ী ছিল না···মেট্রোনা গেছে তার নিজের ঘরে।···

বার্বারার কাছে নিবেদন করলুম···উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে···আমায গভীর শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালোবাসা···চিরদিন শান্তি-সুখে ভূষিত রাখবো বার্বারাকে; ···তাকে এতটুকু বেদনা পেতে দেবো না আমার বুক-ভরা ভালোবাসায···

গদগদ কণ্ঠে বললুম—বলো, বলো বার্বারা, আমার এ-আশা সত্যই কি দুরাশা?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বার্বারা বললে—আমি জানি, আমি জানি, তুমি ভালো ···খুব ভালো! তোমার মাযা আছে, মমতা আছে···অপরের সুখ-দুঃখ তুমি বোঝো, ব্যথা বোঝো··তুমি কলোশভের মতো নও···

আবার সেই নাম! আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে! নিজেকে সম্বরণ করতে পারলুম না···বার্বারার হাত দুখানা আবার নিজের হাতে নিলুম···বার্বারার দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে' বার-বার চুম্বন করলুম! ভবিষ্যতের কত রঙীন ছবি এঁকে তার মনের সামনে ধরলুম···মেঝেয বসলুম একেবারে বার্বারার পায়ের কাছে···তার হাত দুখানি নিজের হাতে চেপে···চোখ বুজে অসহ্য পুলক উপলব্ধি করলুম!

বাহিরে হঠাৎ জুতোয় ভারী শব্দ! বুঝলুম, সেমিয়োনিচ্ আসছে।

···বার্বারা তাড়াতাড়ি উঠে তার নিজের ঘরে চলে গেল···আমার পানে ফিরেও তাকালো না একবার!

সিদোরেঙ্কো এলো ঘরে···কালকের চেয়েও তার অমায়িক ভদ্র ভাব।

আমাকে দেখে সিদোরেঙ্কো হাসলো···পেটে হাত বুলিয়ে বললে—ভয়ানক খিদে পেয়েছে···

মেট্রোনাকে ডেকে তাকে ঘর থেকে বার করিয়ে রঙ্গ-রহস্য সুরু করলে···আমি অবসর খুঁজছি, কখন জানাবো আমার প্রস্তাব।

সে অবসর মিললো না···অথচ এখানে এসেছি সেই কখন! ভাবলুম, আজ ও-কথা থাক! কাল আসবো, কাল বলবো।

বেরিযে পড়বো, আমার সঙ্গে সুরু হলো সিদোরেঙ্কোর রসিকতা! রসিকতা নয়···যেন গোছা-গোছা তীর বিঁধতে লাগলো আমার বুকে! ···শেষে আমার ধৈর্য্য রইলো না আর···বিদায নিযে চলে এলুম।

এসে আমার ভালোবাসাকে ভালো করে' বিশ্লেষণ করতে লাগলুম! মনের অতি-সূক্ষ্ম ভাবান্তরগুলোকে পরীক্ষা করলুম। পুলক-আবেগের প্রথম-উচ্ছ্বাস কতক শান্ত হলে চিন্তা করছিলুম। সে-চিন্তায় কখনো দেখি, আমার পথ মুক্ত অবাধ! আবার মনে হয, সংশয়ের কালো মেঘে ভবিষ্যৎ আপ্রান্ত ঢাকা। বিবাহের সম্বন্ধে সেমিয়োনিচের সেই মন্তব্য মনে পড়লো।···ভাবলুম, বুড়ো গোঁড়া লোক ঐ কথা বলে' আমাদের হুঁশিয়ার করতে চেয়েছিল···তবু মন বার-বার বলতে লাগলো, বাবারা তোমার! তোমার···তোমার···তোমার! আর কারো নয়! সে···আর কারো না··· বার্বারা!

উল্লাসে মন প্রমত্ত হয়ে উঠলো। বাবারার যদি ইচ্ছা না থাকবে সে তাহলে স্পষ্টই বলতো,—না! তা তো বলে নি···ও বললে, বাবার সঙ্গে কথা কয়ো!···

হঠাৎ মনে হলো, এ যেন সেই গল্পের মতো। বাড়ীতে অতিথ এসেছে,—বাড়ীর মালিক অতিথকে বললে—এ বাড়ী নিজের বাড়

মনে করবেন। মালিকের কথায় অতিথের দ্বিধা-সঙ্কোচ কেটে গিযেছিল …নিজেকে সহজভাবে বাড়ীতে করেছিল সুপ্রতিষ্ঠ! মনে হলো কলোশভের উপর বার্বারার সে-অনুরাগ যদি এখনো থাকতো, তাহলে ও-কথা ও কেন বলবে? বলতো,—না! তা বলেনি।…অর্থাৎ কলোশভের দিকটা বার্বারার ভেঙ্গে গেছে…ও চায় বিবাহ করে' ঘর-সংসার পেতে সুখী হতে! ..কেন মিথ্যা আমি ভাবি! ওর মত আছে যখন…

আপনারা ভাবছেন, আমার কাহিনী সত্য নয়! স্রেফ বানানো!… কিন্তু আপনারা যা-ই মনে করুন, এর কোথাও এতটুকু বানানো নেই, মিথ্যা নেই…রঙ ফলানো নেই…নিছক সত্য কথা বলছি আমি।

রাত্রে ঘুম বেশ ভালোই হলো। ঘুমের মতো বন্ধু মানুষের আর নেই! ব্যথা-বেদনা যেমন ভুলিয়ে দেয়, তেমনি আবার পাগল-করা উদ্দাম উচ্ছ্বাস-আবেগকে শান্ত সহনীয় করে' তোলে!

সকালে ঘুম ভাঙ্গলো…মন কিন্তু বিরস! মনে সে-আনন্দ নেই! কেমন একটা অস্বস্তি। কি করে' বসলুন—এই ভেবে লজ্জায় মন যেন নুয়ে পড়ছে। সোমিয়োনিচের সঙ্গে কাল দেখা হলো…বলি-বলি' করে' কেন দ্বিধা করলুম? কেন সে-কথা তখনি খুলে তাকে বললুম না?

দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। কুকুরের ডাক শুনলে খরগোশ যেমন অস্বস্তি বোধ করে'…কুকুরকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ অস্বস্তির ভাব…আমারো তেমনি অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল! আতঙ্কে দেহ-মন ছম্‌ছমে। এমনি অস্বস্তির ভারে খরগোশ যেমন মাঠ ছেড়ে গভীর ঝোপে পালায়—আমার মনে হতে লাগলো, আমিও তেমনি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে, সহর ছেড়ে…সব ছেড়ে ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই!…

কেবলি মনে হতে লাগলো, বলবার কি এত তাড়া ছিল? কেন এমন হুট্ করে' বলতে গেলুম!···কালও এ-কথা মনে হয়েছিল··· তবে কালকের মনে-হওয়ায় আর আজকের মনে-হওয়ায় আকাশ-পাতাল তফাৎ যেন! তাও বেশ উপলব্ধি করলুম। সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও উপলব্ধি করলুম যে মানুষের মনে গোপনে অনেক-কিছু বাসনা থাকে মাথা গুঁজে···সে অনেক-কিছুর অস্তিত্বও মানুষ জানতে পারে না···

অর্থাৎ পৃথিবীর চেহারাখানা যেন আগাগোড়া বদলে গেছে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন এক নতুন পৃথিবী! এই নতুন পৃথিবীর পানে আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি···যেন শিশুর মতো!···কল্পনায় অনেক-কিছু পাওয়া যায়···অনেক-কিছু করা যায়! কিন্তু বাস্তবে? কল্পনা আর বাস্তব···এ-দুয়ের পার্থক্য আমাকে খোঁচা দিতে লাগলো!···

যাক্, যথাসময়ে গাড়ী করে' সেমিয়োনিচের ওখানে হাজির হলুম। সেমিয়োনিচ করলে সাদর-সম্বর্দ্ধনা···সে বেরুচ্ছিল কোন্ প্রতিবেশীর গৃহে! তাকে ফেরালুম, যেতে দিলুম না। বার্বারার সঙ্গে একা দেখা করার কল্পনায় আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল!

স্নিগ্ধ সন্ধ্যা···কিন্তু মনে আশার আভাস কৈ? আনন্দ কৈ?

বার্বারা যেন উদাসিনী! না আছে তার আনন্দ, না কোনো দুঃখ!···নির্লিপ্ত·· সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার মূর্ত্তি!···

তার পানে চাইলুম। আমার দৃষ্টি···খেয়ে-দেয়ে মানুষ নিঃশেষিত পাত্রের পানে যে-দৃষ্টিতে তাকায়, ঠিক তেমনি দৃষ্টি আমার চোখে।··· মনে হলো, বার্বারার হাত দু-খানা যেন বেশ রাঙা! তার পানে চেয়ে চেয়ে আমার মন কখনো আশার উচ্ছ্বাসে উল্লসিত হয়ে ওঠে, কখনো মূর্চ্ছাতুর হয়ে পড়ে নৈরাশ্যের ভারে!···মনের যে প্রার্থনা

ও'কে জানিয়েছি···পরিপূর্ণ ভাষায়···এখন তারি মোহে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন বার্বারার স্বামী···বার্বারা আমার স্ত্রী···আমাদের দুজনের মন মিলে-মিশে এক! আমি বার্বারার, বার্বারা আমার··· দুজনকে এখন চলার পথটুকু শুধু বেছে নিতে হবে···মনে মন মিলিয়ে!

সেমিয়োনিচ গেল মেট্রোনার সঙ্গে পাশের ঘরে। এ-ঘরে শুধু আমরা দুজন।

হঠাৎ মুখ তুলে মৃদু কণ্ঠে বার্বারা জিজ্ঞাসা করলে,—বাবাকে বলেছো?

প্রশ্নটা কেমন যেন···অর্থাৎ প্রশ্নে প্রাণের স্পর্শ পেলুম না! ভাবলুম, বার্বারা অস্বস্তি ভোগ করছে···তাই চটপট্ হেস্ত-নেস্ত করতে চায়!

বললুম,—বলিনি···আজ বলবো।

আমারো আচরণ নির্লিপ্তের মতো।···

সেদিনও সেমিয়োনিচকে বলা হলো না···স্পষ্ট করে' কথাটা বলতে পারলুম না।

ফেরবার সময় সেমিয়োনিচের হাতখানা ধরলুম বেশ আবেগ-ভরে··· বললুম—আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ একটু কথা আছে···এক সময় বলবো।

ব্যস! আর একটা কথা বলতে পারলুম না। বার্বারার পানে চাইলুম, বললুম—আসি বার্বারা।

—আবার দেখা হবে তো? বার্বারা বললে।···

নাঃ, আর আপনাদের বিরক্ত করবো না···ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করেছি, বুঝচি।

মানে, এর পরে আমাদের আর দেখা হয়নি···আমি আর সেমিওনিচেব ওখানে যাইনি! প্রথম কদিন বার্বারার জন্ম মন অধীর হয়েছে, চঞ্চল হয়েছে···আমার দু'চোখে জল···আমি কেঁদেছি···নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি···অমানুষ বলে ভর্ৎসনা করেছি···কলোশভকে যে-অপরাধে অপরাধী করেছি···আমার অপরাধ তার চেয়ে কিসে কম? কিশোরী-কুমারীকে আমিও অত বড় একটা কথা বলে'···

বিশ বার সেখানে যাবো বলে বেরিয়েছি···কিন্তু যাইনি। বার্বারার দীন মলিন মূর্তি! নিঃসঙ্গ···একা··দু-চোখে অশ্রুর ধারা···করুণ কাতর বেদনা-ভরা দৃষ্টি···মন-ভাঙ্গা ব্যথায় জর্জ্জর···বার্বারার কত ছবি আমার মনের পটে ফুটে উঠেছে···অবিরাম! আমার আশায় প্রতীক্ষা করে' থেকে কত সন্ধ্যা নৈরাশ্যে সে অভিভূত হয়েছে হয়তো! ভেবেছি, গ্লানি আর অনুশোচনার ভারে চূর্ণ হয়েছে হয়তো তার মন···তবু আমি যাইনি! বার্বারার উদ্দেশে বার-বার অপরাধ স্বীকার করে তার মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছি মনে মনে।

একবার···এক কিশোরীকে একদিন পথে দেখেছিলুম···দেখতে হুবহু বার্বারার মতো! ভাবলুম, বার্বারা! তখনি ভয়ে অন্য দিকে সরে একটা শস্তা চায়ের দোকানে ঢুকে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি!···

ভাবি, 'কাল'—এ কথার সৃষ্টি করেছে যারা, কোনো বিষয়ে স্থির নিশ্চয় কোনো সিদ্ধান্ত তারা করতে পারে না। মন যখন অনুশোচনায় কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হতো, তখনি মনকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিছি—বেশ তো, কাল যাবো সেখানে।···এ সান্ত্বনায় খুশী হয়ে হাসি-গল্প করেছি, আমোদ করেছি, খাওয়া-দাওয়া করেছি···আরামে নিদ্রা গেছি।···সে 'কাল' কিন্তু জীবনে চিরদিন 'কাল' রয়ে গেছে!

তাছাড়া বার্বারার চেয়ে কলোশভের কথাই বেশী করে' মনে

জাগতো···তার নির্ভীক উদাস মূর্তি চোখের সামনে সব সময় জ্বল্-জ্বল্ করেছে।

তার সঙ্গে আবার গিয়ে দেখা করলুম···তেমনি সমাদরে সে আমাকে গ্রহণ করলে। তারপর থেকে নিত্য তার কাছে যাই, সেআমাকে তেমনি সমাদর করে।···আমার চেয়ে তার মন কত বড়··· বেশ উপলব্ধি করতে পারলুম।···বার্বারার সঙ্গে কলোশভের মিলন-মধুর দিনগুলোতে···আমার মনে যে ভয়, যে সংশয়, যে আক্রোশ পুঞ্জিত হতো, বুঝতে পারলুম, সেগুলো কতখানি অর্থহীন আর হাস্যকর। তারপর আমার সেই পণ, যেমন করে পারি বার্বারার কাছে কলোশভকে নিয়ে যাবো! মনে হলো, কি ছেলেমানুষীই না করেছি!···প্রহসনে এতকাল শুধু ভাঁড়ের ভূমিকায় অভিনয় করে' এসেছি! অথচ কলোশভ বার্বারাকে অমন ভালোবাসতো—বার্বারার বিচ্ছেদ কি সহজেই সে গ্রহণ করেছে!

আপনারা বলবেন,—এ আর এমন কি শক্তি! তোমার বন্ধু কলোশভ একটি মেয়েকে একদিন ভালোবাসলো···তারপর সে ভালোবাসা ছুটে গেল, সে-ও পেলো মুক্তি···এমন তো আখ্‌চার ঘটছে! এ কথা মানি কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলবার ঠিক-ক্ষণটুকু বোঝে, বলুন তো? এ-রকম ঘটনায় গ্লানি নিন্দার ভয়···যে-মেয়েকে ভালোবাসে, শুধু তার নয়···বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিত পাঁচজনের গ্লানি-নিন্দার ভয় কে করে না, বলুন? মহত্ত্ব দেখাবার কিম্বা মনের নিষ্ঠা জাহির করবার লোভ আমাদের মধ্যে ক'জন পারে সম্বরণ করতে?···

ভাবুন, একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি···ভয়ানক ভালোবাসি··· এমন যে এক-দিন তার অদর্শন সহ্য হয় না! মেয়েটি তা জানে এবং

বিশ্বাসও করে, আমার ভালোবাসার উপর নির্ভর রাখে…কিন্তু হঠাৎ একদিন যদি জানতে পারি যে না, আমার ভালোবাসা তাকে কেন্দ্র করে অবিচল থাকতে পারবে না…আমি দুর্ব্বল…এ ভালোবাসার মর্য্যাদা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, তখন সে-মেয়েটির কাছ থেকে নিঃশব্দে যদি সরে আসতে চাই, তাতে মনের কতখানি শক্তির প্রয়োজন!…শস্তা সেন্টিমেণ্ট, বা পাঁচজনের নিন্দার ভয়ে কাপট্য বজায় রাখা—ভদ্রতার লক্ষণ নয়! তাতে ভালোবাসারও অপমান করা হয়!

গোড়াতেই আপনাদের বলেছি, আঁদ্রে কলোশভ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ঠিক নয়!…বার্বারাকে তেমন ভালোবাসেন বলে যেমন বুঝলো, নিঃশব্দে অমনি তার কাছ থেকে সরে এলো। এতে তার অসাধারণত্বের পরিচয় পাই!…জীবনে সমস্যা ঘটলে সত্য দৃষ্টিতে দেখে সে সমস্যার মীমাংসা করতে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন…সে শক্তি যার আছে, তার মনুষ্যত্ব কত বড! সে-ই তো আসল মানুষ! কলোশভ সেই মানুষ…আর সেই মানুষ বলে' কলোশভকে আমি এত বেশী শ্রদ্ধা করি।

আমার কাহিনী শেষ হয়েছে…শুধু একটা কথা বাকী। সে কথা হলো, সেমিনোভিচের ওখানে শেষ যেদিন যাই, তার প্রায় তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন পথে তার সঙ্গে আমার দেখা।…পাশ কাটিয়ে সরে' যাচ্ছিলুম…কিন্তু সে আমাকে দেখেছিল! এসে খপ্ করে' আমার হাত-খানা চেপে ধরলো…ধরে দু'চোখে আগুন জেলে অগ্নি-দৃষ্টিতে বিঁধে আমায় বলেছিল,—যত সব ফাজিল, হতভাগা চ্যাঙড়া ছোকরা!…ব্যস্!

ভদ্রলোক চুপ করলেন।

আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করলুম,—তার পর…বার্বারার কি হলো?

ভদ্রলোক বললেন,—জানি না।

সেদিনকার মতো আমাদের আসর ভাঙলো···আমরা যে যার ঘরে ফিরলুম।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬